ইসলাম ২০০০

ISLAM 2000

মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যান

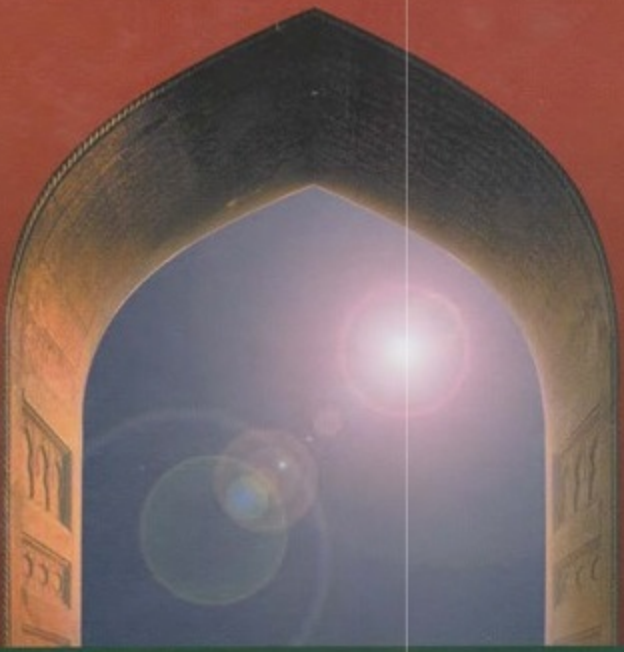

অনুবাদ ঃ মোঃ এনামুল হক

ইসলাম ২০০০

ISLAM 2000

মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যান

অনুবাদ ঃ মোঃ এনামুল হক

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.amarboi.org

ইসলাম ২০০০
ISLAM 2000

মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যান

প্রকাশক
এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী-২০০২
দ্বিতীয় সংস্করণ: জুলাই-২০১২

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান

মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা ফোন-৯৬৬৩৮৬৩
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা ফোন-৭১৬৩৮৮৫

ISLAM 2000 By : Murad Wilfried Hofman, Published by: S. M. Raisuddin Director (Publication), Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000, Price : Tk. 100.00 US $ 4/= ISBN. 984-493-070-7

www.amarboi.org

ভূমিকা

ইসলামের বিষয়ের উপর এটাই আমার প্রথম বই না। যদিও আমার পূর্ববর্তী বইগুলো প্রধানতঃ অমুসলিমদের জন্য লেখা। এই বইখানি মূলতঃ আমার স্বগোত্রীয় মুসলিমদের জন্য লেখা। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে মুসলিম জগত ঠিক কোথায় রয়েছে এবং ঐ শতাব্দীতে ভৌগোলিকভাবে ইসলামকে উপযোগী ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে কি প্রয়োজন- এসব বর্ণনা করতে গিয়ে আমাকে পশ্চিমা জগত এবং মুসলিম বিশ্ব উভয়েরই তীব্র সমালোচনা করতে হয়েছে।

পাঠককে আমি কিছু উপহার দিতে সমর্থ হয়ে থাকলে, তা হচ্ছে বাস্তবতা। কোন কোন পাঠক হয়তো বলবেন নিষ্ঠুর বাস্তবতা। কিন্তু সে সমস্ত পাঠকও হয়তো বুঝতে পারবেন, উল্লেখিত অপূর্ণতাসমূহ আমাকেও কত কষ্ট দেয়। যাহোক, আমি বিশ্বাস করি যে প্রাণহীনতা, আত্মতৃপ্তি, আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং গতানুগতিক কৈফিয়তমূলক মনোবৃত্তি ঝেড়ে ফেলে সংশ্লিষ্ট মুসলিমরা আল্লাহ্‌র ধর্মের সেই পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারবেন যার স্বপ্ন আমরা সবাই দেখি---- বিশ্বমানবতার জন্য।

মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যান
ইস্তাম্বুল ১৯৯৫/১৪১৬

www.amarboi.org

অনুবাদকের ভূমিকা

শ্রদ্ধেয় মুরাদ হফ্‌ম্যান একজন উচ্চ ও সু-শিক্ষিত মুসলমান। তাঁর একটি বাক্যকে একটি অধ্যায়ে এবং একটি অধ্যায়কে একটি বইয়ের রূপ দেয়া যেতে পারে-- তাঁর প্রথম বই পড়ে আমার এই অনুভূতি হয়েছিল। তাঁর লেখায় এক ধরনের তীক্ষ্ণতা রয়েছে যা সমকালীন মুসলিম জগতে বিরল। আমার মত, তিনিও এক বিশ্বজনীন ইসলামে বিশ্বাস করেন বলেই হয়তো তাঁর বই অনুবাদ করার বিশেষ উৎসাহ পেয়েছি আমি। একথা ঠিক যে তাঁর সব ধ্যান-ধারণার সাথেই হয়তো বা আমি একমত নই- আর একমত না হওয়াই বোধ হয় স্বাভাবিক। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর পর্দার Concept এর সাথে আমি একমত নই-- আর শুধু আমি কেন, তিনি নিজেই তাঁর আরেকটি বইয়ে একথা লিখেছেন যে, তাঁর স্বদেশী (জার্মান) ধর্মান্তরিত মেয়েরা তাঁকে এই Concept এর জন্য রীতিমত তিরস্কার করেছে। মুসলমান হিসেবে একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সাথেই আমরা কেবল সম্পূর্ণ একমত হবো- এটাই স্বাভাবিক- কারণ একমাত্র আল্লাহ্‌ ও তাঁর বিধানই আমাদের কাছে নির্ভুল। তবু "Islam 2000" নিগৃহীত, নিপীড়িত ও হীনমন্যতার শিকার আমাদের এই আপাতঃ ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম উম্মার জন্য এক ঝলক আশার আলো বলে মনে হয়েছে আমার কাছে।

আল্‌হামদুলিল্লাহ, কোন বিনিময়ের প্রত্যাশা ছাড়াই শ্রদ্ধেয় মুরাদ হফ্‌ম্যান আমাকে এই অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন। এই অনুবাদ যদি একজন মুসলমানের জীবনকেও সুন্দর ও দৃঢ় করতে সহায়তা করে তবে, আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হবে এবং তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আল্লাহ্‌- সুবহানাহু-ওয়া-তায়ালার। আর এর ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব আমার মানবিক অসম্পূর্ণতার।

বিঃদ্রঃ এই বইয়ে লেখকের বক্তব্যের ক্ষেত্রে প্রথম বন্ধনী ও অনুবাদকের বক্তব্যের ক্ষেত্রে তৃতীয় বন্ধনী ব্যবহার করা হয়েছে।

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্ মনোনীত একমাত্র ধর্ম ইসলাম। এর শ্রেষ্ঠত্বের হাজারো প্রমাণের মধ্যে একটি হচ্ছে, পাশ্চাত্যের বিদ্বান, জ্ঞানী-গুণী বিজ্ঞজনদের মধ্যে কেউ কেউ যখন "উপলব্ধির কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিজ সমাজ-কৃষ্টি-সংস্কৃতির পাহাড় পরিমাণ বাধা ডিঙ্গিয়ে ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করেন। তখন এ কথা মনে করা অতি সঙ্গত যে, সভ্যতার দাবীদারদের ধর্মের চাইতে ইসলাম শ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত।"

আমরা যারা মুসলমান হয়ে জন্ম নিয়েছি তারা এর মর্যাদা যতটুকু বুঝি, তার চাইতে ইসলামের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক বেশী উপলব্ধি করেন একজন নওমুসলিম। কারণ তারা ইসলামকে প্রকৃতভাবে জেনে, বুঝে অনুধাবন করেই মুসলমান হন।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক জার্মানীর অধিবাসী মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যান এমনই একজন নওমুসলিম। তিনি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং জীবনের একটি বড় সময় পৃথিবীর বহুদেশে গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছেন। ইসলাম সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন এবং পরামর্শমূলক এই গ্রন্থটি আরবী, ইংরেজী এবং জার্মান ভাষায় প্রকাশ হওয়ার পর জনাব এনামুল হক সাহেব বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনামূলক এই গ্রন্থখানি আমাদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। বাংলা ভাষার পাঠকদের জন্য তথ্য সমৃদ্ধ এই বইখানা প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমরা পরিতৃপ্ত বোধ করছি। ইসলামকে চলমান সংঘাতময় বিশ্বে আরো বেশী করে গ্রহণযোগ্য করে তোলার পরামর্শগুলি শুধু ভাল লাগার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই নওমুসলিম লেখকের লেখা হবে সার্থক, আমাদের প্রকাশনা হবে অর্থবহ। আল্লাহ্ আমাদের বিশ্বব্যাপী ইসলামের জয়যাত্রাকে এগিয়ে নেয়ার তওফিক দান করুন। আমিন।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.amarboi.org

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়	ঃ মুসলিম ভবিষ্যৎ তত্ত্ব ----------	৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ সামান্য আশাবাদ ----------	৯
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ সৃষ্ট তত্ত্বের পুনর্মূল্যায়ন ----------	১৩
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ ইসলাম কিসের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় -------	১৮
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ ইসলাম ও পাশ্চাত্যঃ পুনরায় মুখোমুখি -----	২৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ কিতাবে ধ্বংস এড়িয়ে চলা যায় এবং ইসলামের কাজ করা যায় ----------	৩৭
সপ্তম অধ্যায়	ঃ আমাদের করণীয়ঃ কি বিশাল দায়িত্ব -------	৬১
পাদটীকা		৬৮

www.amarboi.org

প্রথম অধ্যায়

মুসলিম ভবিষ্যৎ-তত্ত্ব

১৪২০ হিজরীর ২৪শে রমজান, আনন্দ এবং আশা নিয়ে মোটামুটিভাবে সমগ্র বিশ্বই খ্রীষ্ট-পরবর্তী তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনা উদযাপন করবে। ২০০০ সালের ঐ ১লা জানুয়ারী, মুসলিমদের জন্য ভবিষ্যতকালের ভান্ডারে কি রয়েছে তা ভেবে দেখারও প্রয়োজন রয়েছে যদিও মুসলিম ভবিষ্যৎ-তত্ত্ব এ ব্যাপারে সামান্যই আশাব্যঞ্জক বলে মনে হয়। ব্যক্তিগত মন-মানসিকতা ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষে একজন মুসলিমের এ অনুভূতি হতেই পারে যে মদীনা আল-মুনাওয়ারার প্রথম প্রজন্মের মুসলিম সমাজের পর থেকে ইসলাম ক্রমশঃই অস্তগামী। নবী কি আমাদের সতর্ক করে দেননি যে তাঁর পরে প্রজন্মসমূহ ক্রমশঃই বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে?[১] "এমন কোন সময়ই আসবে না যার পরবর্তী সময় তার চেয়ে খারাপ নয়"- নবীর এই বাণী সহ আরো বহু ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণীই সহীহ্ আল-বুখারীর কিতাবুল ফিতান বা Book of affliction-এ রয়েছে।[২] অপর কোন মুসলিম অবশ্য ইতিহাসকে ক্রমবিকাশমান চড়াই-উৎরাই-এর সমষ্টি হিসেবে দেখতে পারেন। আশাবাদী এক তৃতীয় মুসলিম অবশ্য একথাও ভাবতে পারেন যে ইসলামের ক্রমবিকাশ ঘটছে।

এই তিন শ্রেণীর মুসলিমের প্রত্যেকেই অবশ্য কোরান এবং সুন্নায় তার দৃষ্টিভঙ্গীর যৌক্তিকতা খুঁজে পেতে পারে। আমাদের নবী কি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন নি যে ইসলাম পৃথিবীতে এসেছিল আগন্তুক হিসাবে এবং বিদায় নেবে আগন্তুকের মত?[৩] তিনি কি আশংকা করেন নি যে মুসলমানরা ৭৩ অংশে বিভক্ত হবে- ইহুদীরা ৭১ অংশে এবং খ্রীষ্টানরা ৭২ অংশে বিভক্ত হওয়ার পর-- এবং সেই সাথে ইসলামের বিকাশের ব্যাপারে কি নিরাশা ব্যক্ত করেন নি ?[৪] অপর পক্ষে প্রতিবারই অস্তপ্রায় হয়েও আল্লাহর ধর্ম কি পুনরুজ্জীবিত হয়নি? এক প্রতি শতাব্দীর শুরুতেই আমরা কি ইসলামের একজন মুজাদ্দিদ আশা করিনি? বিশেষতঃ প্রতি সহস্রাব্দের শুরুতে?[৫] আবু হামিদ আল গাজ্জালী নিজেকে এমনই একজন পুনরুজ্জীবক মনে করতেন যা তাঁর ইয়াহিয়া উলুমুল দ্বীন বইয়ের নাম থেকেই স্পষ্ট। ইবনে তাইমিয়া, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্, মোঃ বিন আবদুল ওহাব-- ওহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা-- তাছাড়া মোহাম্মদ আবদুহ্ এবং ওস্তাদ আল ইমাম, এঁদের সবাইকেই ইসলামের ঐ ধরনের পুনরুজ্জীবক বলে গণ্য করা যেতে পারে।[৬] যেভাবেই হোক আহমেদ-ই-সিরহিন্দী এমনকি "২য় (মুসলিম) সহস্রাব্দের পুনরুজ্জীবক" এই উপাধিও গ্রহণ করেছিলেন।

www.amarboi.org

নবীর জীবনকালের পরে কখনও ইসলামের কোন পূর্ণ "শুভ সময়" আদৌ ছিল কিনা সে ব্যাপারে আমাদের আশাবাদীরা সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন। উমাইয়া, আব্বাসীয় অথবা অটোমান-কাল এমনকি মুসলিম স্পেনেও ইসলাম কি কখনো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে? সময়ের সাথে সাথে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ঘটে, তাই নয় কি? সূরা আল-আলাকের দ্বিতীয় আয়াতের মত বৈজ্ঞানিক বিষয়ভিত্তিক কোরআনের কিছু আয়াত বুঝতে আমরা কি এখন আগের চেয়ে উন্নততর অবস্থানে নেই (হাজার বছর ধরে যেমন ধরে নেয়া হয়েছে ব্যাপারটি তেমন "জমাট রক্তপিন্ড" নয় বরং যেমন আমরা এখন জানি তা হচ্ছে "লেগে থাকা নিষিক্ত ডিম্বাণু")[৭]?

একজন আশাবাদীও তার দৃষ্টিভঙ্গীকে কিতাবীয় প্রমাণ দ্বারা সমৃদ্ধ করতে পারে। মানবকূলের সর্বশ্রেষ্ঠ জনগোষ্ঠীর (৩ঃ১১০) সেও কি একজন সদস্য নয় যা পৃথিবীতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম-- যদি সে জনগোষ্ঠী তার মনোবৃত্তির অর্থাৎ নীতি ও নৈতিকতার পরিবর্তন ঘটায় ? আমাদের প্রভু আমাদের বলেন "বাস্তবিকই আল্লাহ সেই জনগোষ্ঠীর অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অন্তরের পরিবর্তন ঘটায় (13:11), একথার মানে কি এই নয় যে, সত্যিই যদি ইসলামকে পরিবর্তন না করে আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে সক্ষম হই এবং আমাদের পন্থার পরিবর্তন করি, তবে তিনি অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন? এমন একটা সময় কি আসবে না যখন দেখা যাবে দলে দলে লোক আল্লাহর ধর্মে যোগদান করবে (110:2)? আমাদের নৈরাশ্যবাদীরা অবশ্য জাবির ইবনে আবদুল্লাহ এবং আবু হুরায়রা বর্ণিত একটি হাদীসের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন যেখানে আল্লাহ্‌র রসূল বলেছেন ***"তোমরা দেখ, দলে দলে লোক আল্লাহর ধর্মে যোগদান করেছে- এবং সময়ে তারা দলে দলে এই ধর্ম পরিত্যাগ করবে"***-- এক্ষেত্রে সূরা আল-নাসরকে ভবিষ্যতের কোন চিত্র হিসাবে বিবেচনা না করে ইসলামের মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা হিসাবেই দেখতে হবে। এ ধরনের সন্দেহবাদী কেউ মোহাম্মদ আবদুহ্‌ এবং ফরাসী সূফীদের বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে পারেন যে ইসলাম মুসলিম বিশ্ব থেকে হিজরত করেছে, সেখানে এখন অসংখ্য মুসলিম পাওয়া যায় অথচ সামান্যই ইসলাম দেখতে পাওয়া যায়।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামান্য আশাবাদ

মুসলিম ভবিষ্যৎ-তাত্ত্বিকের মতবাদের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যদ্বাণী করার চেয়ে পৃথিবী এখন যেমন আছে ঠিক সেভাবে তার দিকে চেয়ে দেখাটা অপেক্ষাকৃত বেশী ফলপ্রসূ হতে পারে। আর সামান্য চোখ কচ্‌লে তাকিয়ে দেখলে আমরা কি দেখতে পাই? ইসলাম কি এগিয়ে যাচ্ছে? নাকি কিছু দৃশ্য একপাশে সরিয়ে রাখলে ইসলামকে ক্ষয়িষ্ণুই বলতে হবে? নাকি যেমন তারা বহু শতাব্দী ধরেই করে আসছে, তেমনি, মুসলিমরা, শারিরীক এবং মানসিক ঔপনিবেশিকতার সহজ শিকার হিসাবে ইতিহাসের প্রান্তসীমায় হতবুদ্ধি নির্বোধের মত ছুটোছুটি করছে? কিন্তু এবার আমরা না হয় আশাবাদের দিকটাই প্রথমে শুনি।

এই শতাব্দীতে [বিংশ] যে সমস্ত মানবিক ও বাহ্যিক উন্নতি সাধিত হয়েছে তার মূল্যায়ন করতে হলে, গত শতাব্দীতে মক্কা আল-মুকাররামা এবং আল-মদীনায় জীবনের ধরনধারণ সম্পর্কে যে সমস্ত দুঃখজনক কাহিনী রয়েছে কাউকে তা পড়তে হবে। সুইস মুসলিম জোহান লুডউইগ বার্কহার্ট এর মত মক্কায় পশ্চিমা তীর্থযাত্রীদের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা আমাদের সামনে রয়েছে। ১৮১৪-১৫- তে তিনি মক্কা ও মদীনায় ছয় মাস অবস্থান করেন।[৮]

তার পর্যবেক্ষণের সাথে বৃটিশ মুসলিম স্যার রিচার্ড বার্টন, যিনি ১৮৫৩-য় মক্কা ও মদীনায় গিয়েছিলেন এবং জার্মান অমুসলিম হেইনরিখ ভন মাল্টজান যিনি ১৮৬০ সালে মক্কায় ছিলেন [১০]--- এই দুজনের অভিজ্ঞতা যোগ করা যেতে পারে।

এই তিনজনের প্রত্যেকেই বলেছেন ইসলামের তীর্থস্থানসমূহ তখন ক্ষয়িষ্ণু, নোংরা, বিপদসঙ্কুল এবং কুসংস্কারাছন্ন ছিল। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, হারাম শরীফের ঠিক সামনেই এবং ক্ষেত্র বিশেষে এমনকি ভিতরেও মদ এবং পতিতার দালালরা চড়াও হতো আর নামকাওয়াস্তে নামাজ আদায় করা হতো এমনকি হজ্জযাত্রীদের দ্বারাও। হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা বছরে বছরে কমতে কমতে ১৮১৪ সালে দাঁড়িয়েছিল ৭০ হাজারে (বার্কহার্টের অনুমান) এবং পরবর্তীতে ১৮৬০ সালে (ভন মাল্টজানের অনুমান) কমে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৩০ হাজারে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে নেপোলিয়নের মিসর আক্রমণের পর এবং পরবর্তীতে অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতিবিদগণ এবং প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞগণ উভয়েই, তাদের জীবদ্দশায়ই ইসলাম সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এমনটি দেখতে পাবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আগেই, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ করা দরকার, এমন একটি সাংস্কৃতিক বিষয় হিসেবেই তারা

www.amarboi.org

ইসলাম সম্বন্ধে পড়াশুনা বা গবেষণা করছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ ফরাসী ঔপনিবেশিকগণ আলজিরীয় বীর, কূটনীতিজ্ঞ এবং সূফী-সাধক আবদুল কাদেরকে ঠিক এই মন-মানসিকতা নিয়েই প্রশংসা করতে পেরেছিলেন, তাকে কেবলমাত্র হারিয়ে যাওয়া লোকগাথার একজন ব্যক্তিত্ব ভেবে, যার হয়তো নগণ্য কোন মূল্য রয়েছে।[১১] যোহান উলফগ্যাঙ্গ ভন গ্যেটের মত যে ব্যক্তিত্বসমূহ, এমনকি ঐ সময়ও ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন তারাও কেবল ইসলামের অনমনীয় একেশ্বরবাদকেই পছন্দ করতেন, কিন্তু মুসলিম বিশ্বে জীবনধারণ করা ইসলামকে নয়।[১২]

এই নৈরাশ্যজনক পটভূমিকে স্মরণ রেখে, আজ যখন কেউ হজ্জ বা ওমরা পালন করে, তখন কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা অনুধাবন করতে গিয়ে সত্যিই অবাক হতে হয়!

মক্কার মসজিদুল হারাম এবং মদীনার মসজিদে নববী চারলক্ষ আশি হাজার থেকে ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হজ্জযাত্রীকে স্থান দেবার মত করে সুন্দরভাবে বর্ধিত করা হয়েছে। যদিও ক্রমবর্ধমান বিশ্বাসী যারা তাদের ফরজ হজ্জ পালন করতে আসেন, তাদের স্থান সঙ্কুলান করতে এখনও তা অপর্যাপ্ত। জাতিভিত্তিক ভিসার কোটার মাধ্যমে তাদের সংখ্যার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মদ নিশ্চিহ্ন হয়েছে, চুরির কথা কদাচিৎ শোনা যায়, একাকী মহিলাদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না এবং সার্বজনীনভাবে নামাজ আদায় করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে দৃশ্যমান ইসলামের প্রতি প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনও একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচক। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে কুখ্যাত লরেন্স অব অ্যারাবিয়ার মত করে ইসলাম শিক্ষার চেয়ে তখনকার প্রথম সারির ইউরোপীয়ান শিক্ষাবিদদের এমন একটা দল সৃষ্টি হয়েছিল যারা সর্বান্তঃকরণে ইসলামকে গ্রহণ করেছিল। এদের মাঝে ছিলেন রিনে গোয়েনন, মার্টিন লিংস, টাইটাস, বার্কহার্ড আর অবশ্যই লিওপোল্ড ওয়েস ওরফে মোহাম্মদ আসাদ, আর প্রাচ্য বিশেষজ্ঞদের মাঝে জ্যাকসবার্ক, লুই ম্যাসিগনন, ডেনিস ম্যাসন এবং অ্যানমেরী শিমেল এর মত ব্যক্তিত্বরা রয়েছেন যারা আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে বিরত থেকেছেন, কিন্তু যারা শাহাদা গ্রহণের দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেছেন বলে ধারণা করা হতো।

এদের প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞ সহকর্মীদের অনেকেই তখন আর তাদের বিষয়- ইসলামকে - অবজ্ঞা আর লুক্কায়িত ঘৃণা সহকারে নয় বরং সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সহকারে জানতে ও বুঝতে শিখেছে।

একই সাথে ১৯৩০ এর পর থেকে তৃণমূল পর্যায়ে মুসলিম পুর্নজাগরণের আন্দোলন সমূহ দারুল ইসলামে, ইসলামকে রাজনৈতিক কর্মসূচীতে স্থান দিয়েছে। হাসান আল বান্না কর্তৃক গঠিত মিশরীয় মুসলিম ব্রাদারহুডের মত সংগঠনসমূহ এবং তাদের প্রচারকরা- যেমন, সৈয়দ কুতুব, আবুল আলা মওদুদী, শায়েখ কিসক ও মোহাম্মদ আল গাজালী- হচ্ছেন এর সাধারণ উদাহরণ।[১৩]

www.amarboi.org

কিন্তু পুনর্জাগরণ কেবল নীচ থেকেই আসেনা। ওহাবী এবং মানুসী আন্দোলন উভয়ই এবং আংশিক হলেও মোহাম্মদ আবদুহ্ ধাঁচের সালাফিয়া আন্দোলন উপর থেকে একটা মুসলিম পুনর্জাগরণের সূচনা করেছে যা পেট্রো-ডলারের মদতপুষ্ট হবার সম্ভাবনা থেকে অনেকাংশেই ব্যাপ্তি লাভ করেছে। এখন যেমন দেখা যায়, আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ-ব্রুনাইয়ের সুলতান, বাদশাহ ফাহাদ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাস্তের আমীর জায়েদ-এরা সবাই বিশ্বজুড়ে ইসলামী দাওয়াতের প্রাণ সঞ্চারকারী মুসলিম ব্যক্তিত্ব। মদীনার বাদশাহ ফাহাদ প্রকাশনী থেকে বিনামূল্যে বিলি করা ইংলিশ ও ফ্রেঞ্চ অনুবাদ সমেত লক্ষকোটি কপি কোরআনের কথাই শুধু ভেবে দেখুন।

মোটকথা এই অগ্রগতি যা কিনা মুসলিম বিশ্বে এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে সমগ্র পৃথিবীতে 'মৌলবাদী হুমকি' বলে বিবেচিত হয়, তা ইসলামকে গত পঁচিশ বৎসরে গণমাধ্যমে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়ে পরিণত করেছে।

ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এমন আশা আর করা হয় না, বরং এর প্রসার ঘটবে এবং এমন কি বিস্ফোরণ ঘটবে এমন আশঙ্কাই করা হয়। ভবিষ্যতে সম্ভাব্য যুদ্ধাবস্থায়, কি ধরনের পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে, সে সম্বন্ধে এখন যখন NATO General-দের উপদেশ দেয়া হয়- তখন পূর্ব-পশ্চিম সংঘাতের কথা না ভেবে বরং উত্তর-দক্ষিণ সংঘাতের কথা মনে রাখা হয়। যেখানে ইসলাম হচ্ছে নতুন সম্প্রসারণশীল এবং আক্রমণাত্মক শত্রু।

অভিবাসনকারী মুসলিম এবং স্থানীয় মুসলিমরাই এই ভয়ের জন্ম দিয়ে থাকে, যাদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে প্রায় সবর্ত্রই। আমেরিকা এবং জার্মানীতে এখন প্রায় ২০ লক্ষ মুসলিমের বসবাস। বৃটেনের মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ আর ফ্রান্সের হচ্ছে-২৫ লক্ষ। ১৯৯১ সালে পশ্চিমা সূত্রের দেয়া তথ্য অনুযায়ী মোট মুসলিম জনসংখ্যা হচ্ছে ৯৯০,৫৪৭,০০০ -রক্ষণশীলভাবে তৈরী সংখ্যা যদিও, তবু এ সংখ্যাই অনেক বড় এবং দুঃশ্চিন্তার জন্ম দিয়েছে। [১৪]

তাই Los Angeles, ও Moscow থেকে শুরু করে Rome এবং Zagreb, পৃথিবীর সর্বত্রই মসজিদের উন্মেষ ঘটছে। উমাইয়া খলিফাদের এক কালের অবস্থান Cordoba তে, ১৯৯৪ সালে স্প্যানিশ মুসলিমরা Al-Andalusia-এর Averroes [আবু রুশদ] আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। Cordoba-র অদ্ভুত সুন্দর সেই পুরানো মসজিদের কাছেই, আবার মুয়াজ্জিনের আযান শোনা যাচ্ছে। স্পেনের মাটি থেকে শেষ মুসলিমটিকে বিতাড়িত করার পাঁচ শত বৎসর পরে এই ঘটনা- কি সাংঘাতিক উস্কানি।

বর্তমানে সারা বিশ্বে যে ইসলামই একমাত্র বিস্তার লাভকারী ধর্ম- এ সব তারই উপসর্গ।

দিল্লীতে বসে ১৯৩৪ সালে লেখা, Islam at the crossroad বইতে Muhammad Asad (মৃত্যু ১৯৯২) তখনি ইসলামের উর্ধ্বগতি সম্বন্ধে তাঁর অবাক করে দেয়া ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন। Salafiyah ধারায় পশ্চিমের অনুকরণ না করে বা

www.amarboi.org

পশ্চিমের কাছে কৈফিয়ত না দিয়েই Asad পশ্চিমা সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণু (সভিয়েট- ইউনিয়ন সহ) বস্তুবাদের বিপরীতে ইসলামকে এক পরিপূর্ণ এবং সুস্থ বিকল্প হিসেবে বর্ণনা করেন।

নাস্তিক ধনতান্ত্রিক পশ্চিম এবং একই পর্যায়ের নাস্তিক, অথচ কম্যুনিষ্ট প্রাচ্যের মাঝে বিশ্বজনীন দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী মনে করেছিলেন। তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে তাদের মাঝের বৈরীভাব উভয় পক্ষের মাঝে বিপর্যয় ডেকে আনবে-তাঁর ভাষায় *"পশ্চিমা সভ্যতার বস্তুবাদী আত্মতৃপ্তি পশ্চিমা জগৎকে এমন ভয়ঙ্কর পর্যায়ে নিয়ে যাবে, যে এর জনসাধারণ আবারো আধ্যাত্মিকতার সত্য খুঁজতে শুরু করবে এবং তখন হয়তো ইসলামের সফল প্রচার সম্ভব হতে পারে।"*

ধ্বংস হয়ে যাবার পরিবর্তে যখন পশ্চিমাজগত, দুই পরাশক্তির শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল, তখন মনে হয়েছিল, আগামী বহু দশক এরা ভারসাম্য রক্ষা করে চলবে। আর ঐ পটভূমিতে ষাট বৎসর পূর্বের Muhammad Asad-এর ভবিষ্যৎ কল্পচিত্রও অবাস্তব মনে হয়েছিল।

১৯৯০ সালের পর থেকে, কম্যুনিষ্ট আদর্শ এবং ব্যবস্থার দেউলিয়াপনা দেখে, এবং আধ্যাত্মিক চেতনা তথা মূল্যবোধ সংকটে আক্রান্ত পশ্চিমের বিপদজনক পাপাচার দেখে, আজ আমরা জানি যে Muhammad Asad-ই সঠিক ছিলেন- কেননা খৃষ্টধর্ম কার্যতঃ নিজের মূল্যবোধের পরিবর্তনের এক ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রম করছে। আর তথাকথিত "আধুনিকতা প্রকল্প" তো আমাদের চোখের সামনেই ভেঙ্গে পড়ছে।

পশ্চিমা ধর্মতাত্ত্বিক এবং বৈজ্ঞানিকরা, এরই মাঝে, তাদের ধ্যান- ধারণার ভিত্তি আদৌ বহাল রয়েছে কিনা, তাই সন্দেহ করতে শুরু করেছেন।

www.amarboi.org

তৃতীয় অধ্যায়

সৃষ্ট-তত্ত্বের পুনর্মূল্যায়ন

পশ্চিমা জগতের আধ্যাত্মিক সংকট সবচেয়ে ভালো ফুটে ওঠে, খৃষ্টান খৃষ্টতত্ত্বের একটা বিশ্লেষণ যখন করা হয় তখন- অর্থাৎ যীশুখৃষ্টের ভূমিকা এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে বর্তমান ধর্মযাজকদের দৃষ্টিভঙ্গী কি তার বিশ্লেষণ যখন করা হয়।

এই ক্ষেত্রেও ১৯৩৪ সালে লিখতে গিয়ে Muhammad Asad অভাবনীয় দূরদর্শিতার পরিচয় দেনঃ

"ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে যীশু খৃষ্টের বর্তমান পরিচিতিই ইউরোপে ধর্ম বিকাশের সবচেয়ে বড় বুদ্ধিভিত্তিক সমস্যা। চার্চের প্রচারণায় ঈশ্বরকে যে ভাবে উপস্থাপন করা হয়, তাতে ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা স্বভাবতঃই নিজেদের গুটিয়ে নেন- তারা যেহেতু এই ধারণার সাথেই কেবল পরিচিত, সেহেতু তারা ঈশ্বরের ধারণাটাকেই প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেন, আর সেই সঙ্গে ধর্মের ধারণাকেও।"

কি সত্যিই না Asad বলেছিলেন। আমরা দেখতে পাবো, আমরা ঠিক সেই জায়গাতেই এখন রয়েছি।

এই বাস্তবতাকে সঠিক বুঝতে গেলে, আর বর্তমানে পরিবর্তনের অভাবনীয় সম্ভাবনাকে যাচাই করতে চাইলে, আমাদের সেই ন্যাক্কারজনক Council of Nicaea-র কথা (৩২৫ খৃঃ) এবং পরবর্তী দীর্ঘ ষোল শতক ধরে তার ভাবাদর্শের মারাত্মক পরিণতির কথা অবশ্যই স্মরণ করতে হবে।

সড়ক পথে Byzantium (এখন Istanbul) থেকে ১৯৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত Nicaea-তে, Pope Sylvester I নয়, বরং তখন পর্যন্ত মূর্তিপূজক রোমান সম্রাট Constantine I, ৩২৫ সালে এক ধর্মসভা আহবান করেছিলেন (কাউন্সিল)। ৩২৫ সালের ২০ মে, সম্রাট কর্তৃক উদ্বোধনকৃত Nicaea-এর প্রথম কাউন্সিলে ২২৫ জন ধর্মযাজক উপস্থিত ছিলেন, যাদের প্রায় সবাই পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধি ছিলেন। Constantine এই কাউন্সিলকে এমন মত অবলম্বন করতে বলেছিলেন (Nicene Creed) যা কিনা আজও পর্যন্ত একদিকে খৃষ্টান ও অন্যদিকে ইহুদী ও মুসলিম এই দুই ভাগে ধর্মীয় মতবাদকে বিভক্ত করে রেখেছে।

কোন পূর্বলিখিত প্রস্তুতি বা আলোচনা ছাড়াই, এই কাউন্সিল, মূর্তিপূজক সম্রাট কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে *"যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র তথা খোদ ঈশ্বর, সৃষ্ট নন বরং ঈশ্বরের সমসাময়িক ও সমান্তরাল উপস্থিতি সম্পন্ন বলে চিহ্নিত করে।"* এই মতবাদই অবতার তত্ত্ব তথা ত্রয়ীর ধারণার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

www.amarboi.org

এই মতবাদের তাৎক্ষণিক ফলাফল খুবই দুঃখজনক ছিল-কেননা Alexandria-র Bishop Arius এর অনুসারী ঐ সময়কার সংখ্যাগরিষ্ঠ খৃষ্টান তথা ইহুদী পটভূমির খৃষ্টানগণ সব সময়ই জেনে এসেছেন : যীশু ঈশ্বরের সম পর্যায়ের কেউ নন, বরং ঈশ্বরের বাছাইকৃত একজন মানুষ-এক কথায় নবী। তাদের এখন মনে করা হচ্ছে "ভ্রষ্টাচারী" এবং তারা অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন।[১৫]

অবতার এবং ত্রয়ীর তত্ত্বকে যুক্তি দিয়ে বোঝার এবং ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টায়, ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায়ের, তাত্ত্বিক এবং দার্শনিকগণ এযাবত অনেক সময় এবং শ্রম ব্যয় করেছেন। কিন্তু কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই তারা বিফল হয়েছেন- তাছাড়া আর তো কিছু হবার কথা নয়। সাথে সাথে তারা এই তথাকথিত "অব্যর্থ যুক্তিকে" অবলম্বন করেছেন যে, উভয় মতবাদই এক ধরনের রহস্য। অবশ্য তা করতে গিয়ে তারা এই সত্যটাকে অবজ্ঞা করেছেন যে, যীশুর কোন সমর্থিত বাণীতেই এই ধরনের রহস্য অনুমান করার মত কোন ভিত্তি নেই। অপর পক্ষে, মুহাম্মদ (দঃ) এর মতই, যীশু নিজেকে একজন নির্ভেজাল মানুষ মনে করতেন।

ক্যাথলিক মতবাদের প্রভাবমুক্ত থেকে, মুসলিমরা তাদের নিজস্ব খৃষ্টতত্ত্ব আঁকড়ে ধরে রেখেছে। যা কিনা কোরআনে অত্যন্ত সুচারু রূপে এবং পরিচ্ছন্নভাবে বর্ণিত রয়েছে- যেখানে যীশু ছিলেন :

* আদমের মত সৃষ্ট (3:47, 59;23:91, 112:3)
* কুমারীর গর্ভজাত (3:47)
* তাঁর পূর্বের আসমানী কিতাব সত্যায়নকারী (3:50)
* তাঁর পূর্বের নবীদের ন্যায় একজন নবী (2:136, 3:84, 6:85)
* ত্রয়ী সত্তার একজন নন (4:171, 5:73)

এমনকি তথাকথিত মুসলিম আধুনিকতাবাদীরা বা "প্রচলিত, বা গতানুগতিক মুসলিমরা" ও কখনো যীশুর-এই ইসলামী ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেনি।

"ঈশ্বর নিজের জন্য একজন পুত্র গ্রহণ করেছেন" (18:4-5, 19:88-89) এই ধারণাটা গত দুই শতাব্দী যাবৎ, খৃষ্টান জগতেও অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে শুরু করেছে। যীশু সম্বন্ধে নিবদ্ধিত মতবাদের বিশ্বাস-যোগ্যতা হারানোর ফলে, এই সময়ে নাস্তিকতার বিস্তার ঘটেছে আর ক্রমেই বর্ধিত হারে মানুষ প্রতিষ্ঠিত গির্জাকে প্রত্যাখ্যান করে- নারীবাদী ধর্মতত্ত্ব, বৌদ্ধ ধর্ম বা রেড ইন্ডিয়ানদের Shamanism এর মত নানা গূঢ়তত্ত্বে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

গত ষাট বৎসর যাবত, গোঁড়া খৃষ্টান মতবাদের কাঠামোর ভিতরে, যীশুর অবস্থানকে পুনর্ব্যাখ্যা করার প্রবল চেষ্টা পরিলক্ষিত হওয়াটা তাই স্বাভাবিক। প্রটেস্টান্ট চিন্তাবিদ Karl Barth (মৃত্যু ১৯৬৮) এবং Rudolf Bultmann (মৃত্যু ১৯৭৬) তথা Jesuit Professor Karl Rahner হচ্ছেন এই প্রচেষ্টার অগ্রপথিক।

www.amarboi.org

Barth যীশুকে কেবল একজন মানুষ বলেই বিবেচনা করেছিলেন, যাঁকে ঈশ্বর তার কর্তব্যের জন্য বিশেষ ভাবে বেছে নিয়েছিলেন- একটা গ্রহণযোগ্য অবস্থান বা আসন বটে। বাইবেলকে রূপকথা/ উপকথা মুক্ত করতে গিয়ে Bultmann তার ইতিহাস-বিশ্লেষণ পন্থাকে এমন ভাবে ব্যবহার করেছেন, যাতে বেশীর ভাগ তাত্ত্বিকই আজ-এ ব্যাপারে একমত হবেন যে, বাইবেলের উপর ভিত্তি করে "ঐতিহাসিক যীশু" কে বর্ণনা করা সম্ভব নয়- বাইবেল [নতুন পুস্তক] এরকম একটা কিছুর জন্য পর্যাপ্ত নির্ভরযোগ্য ভিত্তি সরবরাহ করতে স্রেফ অক্ষম। Rahner অবশ্য Nicaea-র কাউন্সিলকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বুদ্ধিভিত্তিক কসরতে লিপ্ত হয়েছেন। একদিকে অবতার-তত্ত্বকে পুনর্বিন্যাস করতে গিয়ে তিনি সাহসের পরিচয় দিয়েছেন- বলেছেন যীশু অবশ্যই একজন মানুষ ছিলেন, যাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। তার মতে, প্রেরণার মাধ্যমে ঈশ্বর যে কারো মাঝেই আবির্ভূত হতে পারেন- যীশু হচ্ছেন ঈশ্বরের ঐশ্বরিক প্রেরণার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। অন্যদিকে, এই একই Professor Rahner এমন ধর্ম বিরোধী তত্ত্বের অবতারণা করেছেন যে, ঈশ্বর চাইলে তার অংশীদার সৃষ্টি করতে পারেন না।

খৃষ্টানদের খৃষ্টতত্ত্ব যে গভীর দুর্যোগের মাঝে রয়েছে, তা বোঝাতে উপরের আলোচনাই যথেষ্ট মনে হয়। "যেমন দেখ, যারা তাদের পূর্বসূরীদের কাছ থেকে আসমানী কিতাব উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, তারা এখন গভীর সংশয়ে রয়েছে, যা কিনা তাদের ঐ আসমানী কিতাবের বিধিনিষেধকে সন্দেহ করার পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে" (42:14, Al-Quran, Muhammad Asad-এর অনুবাদ)

দেরীতে হলেও, সমকালীন Protestant এবং Catholic তাত্ত্বিকগণ, উভয়েই, অগ্রহণযোগ্য ধর্ম-বিশ্বাসের সূত্রের আবর্জনার ভার যথাসম্ভব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, কোনমতে ভেসে থাকার চেষ্টা করছেন।

তাই খৃষ্টান শিবিরের মাঝে এখন নিম্নোক্ত তিনটি ধারার খৃষ্টতত্ত্ব স্পষ্ট :

* যীশু ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না।

* ঈশ্বর কর্তৃক বাছাইকৃত এবং অনুপ্রাণিত একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন যীশু- কিন্তু তিনি যেমন ঈশ্বরের সমপর্যায়ের কেউ নন, তেমনি তিনি তার সমাধি থেকেও পুনরুত্থিত হন নি। [১৬]

* সব ধর্মের অনুসারীদের মাঝেই দোষ, গুণ সমান ভাবেই ছড়িয়ে আছে -তারা সবাই, সীমিতভাবে হলেও, একই সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে। (Paul Schwarzenau, John Hick)

প্রথম ধারা থেকে এক মহাজাগতিক যীশু'র গূঢ়তাত্ত্বিক [Mystic] সংজ্ঞার সৃষ্টি হয়েছে। প্রাক্তন Dominican যাজক Matthew Fox এমনভাবে এই ধারণার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন, যেন একজন *"ঐতিহাসিক যীশু"*র ভিত্তি ছাড়াই, তার *"মহাজাগতিক যীশু"*র অনুমান গ্রহণযোগ্য। (Fox যেন বলতে চাচ্ছেন, যীশুর এই ধারণাটা এতই সুন্দর যে, যে কারো এই যীশুকে আবিষ্কার করা উচিত, যদিওবা এই যীশুর অস্তিত্ব ছিল না)।

এ ব্যাপারে John Hick (Birmingham) -এর কথাই ঠিক যে, ইতিহাসের বাইরে যীশুর এমন চরিত্র বর্ণনা করা, তাঁকে ঐশ্বরিক বাস্তবতা হিসেবে গণ্য করারই সমতুল্য।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় ধারা একটা সমস্যার জালে আটকে যায়- পুনরায় মানবীকরণের পর, অন্য নবী-পয়গাম্বরের চেয়ে তাঁকে বিশেষ করে দেখানোর আর কিছু থাকে না। আর তা হলে, সেই ধরনের Messiah তো Quran-এর বর্ণিত ঈসা মসীহ্ই হয়ে যান।

"চার্চের বাইরে কোন ত্রাণ নেই"-নিজেদের পৃথকীকরণের Catholic এই মতবাদ (১৯৬২-৬৫-র দ্বিতীয় Vetican Council-এর পরে বাতিল হয়ে যায়) -এর পরিবর্তে, খৃষ্টান চিন্তাবিদগণ কেন অন্যদের সাথে নিজেদের বিশ্বাসের সহাবস্থানের নতুন মতবাদের কথা বলছেন- তা উপরে বর্ণিত দ্বন্দ্ব বা সমস্যার আলোকে পরিষ্কার বোঝা যায়। তারা এখন বলতে চান, যীশু সবার জন্যই ত্রাণের বাণী বয়ে নিয়ে আসেন। এই তত্ত্ব সব মুসলিমকে পরিষ্কার ভাবে Karl Rahner -এর ভাষায় "anonymous christian``বা নামহীন খৃষ্টানে পরিণত করে (ধন্যবাদ!)। এই তত্ত্বের আরেকটা অনুসিদ্ধান্ত রয়েছে: খৃষ্টান জগতে যীশু এবং তাঁর মাত্রা সম্বন্ধীয় গতানুগতিক ধারণাসমূহকে এমন ভাবে কাটা ছেঁড়া করা হয়েছে, যে, আজ আমরা বলতে পারি- *কেবল মুসলিমরাই এসবের ঐতিহাসিক সত্যতা ও মর্যাদাকে সমুন্নত রেখেছে।*

তৃতীয় ধারা সব ধর্মকে একাকার করে এমন একটা মতবাদ সৃষ্টি করতে চায়, যার জন্য আজকের "খৃষ্টান-উত্তর" যুগ এক উর্বর ক্ষেত্র।[১৭] এই দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য যুগে যুগে গূঢ়তাত্ত্বিকদের মাঝে সবসময়ই প্রিয় ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, Konya-র Mevlana এবং "ঘূর্ণায়মান দরবেশ" দের অনুপ্রেরণা দানকারী জালাল আল্‌দীন রুমি, ইতিমধ্যেই, মহাজাগতিক ভালোবাসার সার্বজনীন এক ধর্মের কথা প্রচার করেন। তার "দিওয়ান" এ, তিনি বলেন, "আমি খৃষ্টান নই, ইহুদীও নই বা পার্সি অথবা মুসলিমও নই।"[১৮]

Ludwig van Beetohoven তার নবম Symphony-র জন্য Friedrich schiller -এর যে পদ্য বেছে নিয়েছিলেন, তাতে এই মহাবিশ্বভিত্তিক একতার অনুভব খুব সুন্দর ভাবে ফুটে ওঠেঃ ***"Seid Umsclungen, Millionen"*** (হে লক্ষ মানব, আলিঙ্গনাবদ্ধ হও)।

এই শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াসমূহের সম্ভাবনা সত্যিই শ্বাসরুদ্ধকর : ১৪ শতাব্দী সময়কালে, প্রথম বারের মত এমন একটি বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, খৃষ্টান প্রচারণা বা শিক্ষা-ইহুদী, খৃষ্টান এবং কোরআনিক যীশুর প্রতিচ্ছবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

তা যদি সত্যিই ঘটে, তবে এই জরুরী ক্ষেত্রে ইসলাম তার করণীয়টুকু সমাধা করেছে বলে বলা যাবে এবং প্রথমবারের মত, খৃষ্টান-ইহুদী-মুসলিমদের মাঝে ত্রিমুখী আলোচনার অগ্রগতি আশা করা যেতে পারে- কেবল সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, বরং মতাদর্শের ক্ষেত্রেও। ক্যাথলিক অধ্যাপক Hans Kung যা বলে আসছেন তার উল্টোটাই বরং হবে- যীশুর মর্যাদা নিয়ে কোন প্রশ্ন করা যাবে না, এমন বাধ্যবাধকতা আর থাকবে না। যার ফলে, অবশেষে খৃষ্টানরা হয়তো কোরআনকে আরো একটা সত্যিকার আসমানী কিতাব এবং মুহাম্মদ (দঃ) কে আল্লাহ্‌র নির্বাচিত মাধ্যম হিসেবে গণ্য করতে প্রস্তুত থাকবে।

www.amarboi.org

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলাম কিসের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়

পরিতাপের বিষয়, খৃষ্টানরা দলে দলে আল্লাহ্‌র ধর্মে যোগদান করছে (সূরা নস্‌র, আয়াত-২), আমরা এমন একটা দৃশ্য দেখতে পাবো তা আশা করার তেমন কোন কারণ নেই। প্রতিষ্ঠিত খৃষ্টান চার্চ সমূহের আশু পতনের ফলে, বহুধার্মিক ধর্ম-বাজারে, গূঢ় তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার চাহিদা যে বেড়ে যাবে, এমন সম্ভাবনাই বেশী। অনেক জ্ঞানী এবং ব্যক্তি-কেন্দ্রিক প্রাক্তন চার্চ সদস্যই, চার্চের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে, ইসলাম গ্রহণ না করে, বরং যারা নিজের স্পৃহাকে উপাসনা করে (45:23), তাদের মতই আচরণ করবে।

এক কথায় বলতে গেলে, খৃষ্টরাজ্য আমেরিকা এবং ইউরোপে ইসলামের বিরাট সাফল্য সত্ত্বেও, একবিংশ শতাব্দীতে এসব দেশে ইসলামকে খুব সম্ভবতঃ এমন এক মিশ্র মনোবৃত্তির মুখোমুখি হতে হবে, যা আমাদের নবীর সময়কার মক্কার মত : নব্য-বর্বরতা, নাস্তিকতা, নব্য বহু-দেব-উপাসনা, এবং বর্ণবাদিতা-এমন মানুষজনের মুখোমুখি হতে হবে যারা কোকেন, জ্যোতির্বিদ্যা, Boris Becker অথবা Claudia Schiffer - এর মত প্রতিমার পূজা করবে।

আমার মতে, যুদ্ধের বিভাজন রেখা বা সীমান্ত রেখা মুসলিম ও খৃষ্টান বা খৃষ্টান ও ইহুদী এই ধরনের জনগোষ্ঠীকে বিভক্ত করবে না বরং তা হবে অত্যন্ত গভীর পরিখা, যার একপাশে থাকবে সংখ্যালঘু আল্লাহ্‌য় বিশ্বাসী মানুষ-আদি অর্থে যাদের মুসলিম বলা যায়- অপর পাশে থাকবে পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষ, যাদের কাছে ক্রমেই আল্লাহ্‌র ধারণা গুরুত্বহীন এবং অর্থহীন হয়ে গেছে; এমন মানুষ-যাদের কাছে সত্য সীমিত হয়ে গেছে যা কিছু দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, শুঁকে দেখা যায়, স্বাদ গ্রহণ করা যায় অথবা শোনা যায় সে সবের মাঝে-যাদের জন্য কোন ধর্মীয় বিশ্বাস হচ্ছে কুসংস্কার- "জনগণের জন্য আফিম" (Marx) এরং যুক্তি, সাহস এবং বুদ্ধিমত্তার অভাব প্রকাশকারী এবং আত্ম-প্রবঞ্চনার নিদর্শন।

এ ব্যাপারে, সক্রিয় নাস্তিক নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত সাবেক কম্যুনিষ্ট সমাজসমূহের সাথে পশ্চিমা দেশসমূহের কোন পার্থক্য নেই। এই সমস্ত দেশে, যদিও খোলাখুলিভাবে নাস্তিকতাকে কখনো উৎসাহিত করা হয়নি, তবু কট্টর বস্তুবাদ এবং ভোগবাদ (Consumerism) এর রূপ ধরে, নাস্তিকতাই সাধারণ জীবনধারায় পরিণত হয়েছে।

অবস্থা দৃষ্টে এমন মনে হয় যে, Marx, Darwin, Nietzsche ও Freud এবং সেই সঙ্গে সামগ্রিকভাবে উনবিংশ শতাব্দীর বস্তুবাদ (Positivism) এবং বিজ্ঞানবাদ

www.amarboi.org

(Scientism) কে, যেন পাশ্চাত্য জনগোষ্ঠী বিষাক্ত গ্যাসের মত শ্বাসের সাথে গ্রহণ করে নিজেদের সাথে মিশিয়ে নিয়েছে।

একদা উপনিবেশে পরিণত হওয়া অথবা পাশ্চাত্য জীবন ধারায় দীক্ষা গ্রহণকারী সরকার দ্বারা শাসিত মুসলিম দেশসমূহও কতকটা, ঐ একই পথে যাত্রা করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, Istanbul, Ankara এবং Izmir-এর বুদ্ধিজীবি মহল, ইউরোপীয় আধুনিকতার পক্ষে তুরস্কের মোস্তফা কামাল যখন ধর্মীয় ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করলেন- তার দুই প্রজন্মের ব্যবধানে, এই সত্যটি আবিষ্কার করেছেন যে তাদের ছেলেমেয়েদের ইসলাম সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণাটুকুও নেই। তারা নামাজ পড়তে শেখে না, এমনকি সূরা ফাতেহাও আবৃত্তি করতে পারে না।

অবশ্য রোজা না করেও, তারা এখনও Seker Bayrami (Eid-ul-Fitr) উদযাপন করে থাকে- অনেকটা সেই সমস্ত খৃষ্টানদের মত, যারা ঈশ্বর অথবা যীশু সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়েই যথারীতি বড়দিন উদযাপন করে থাকে।

ইউরোপ এবং আমেরিকা যে এখনো নিজেদের "খৃষ্টান" ভাবে, তার সাথে আমাদের উপরোক্ত মূল্যায়নের কোন বিরোধ নেই। কিন্তু খৃষ্ট-জগত বলতে এখন কেবল এটুকুই বোঝায় যে, এই জগতের জনমত, এটা স্বীকার করে যে তারা, খৃষ্টান এবং সমভাবে সনাতন গ্রীক ও রোমান ঐতিহ্যের থেকে উদ্ভূত মুক্তমনা এবং "মানবিক" এক সভ্যতার কাছে ঋণী। ব্যাপটিজম, চার্চে বিয়ে এবং চার্চের সহায়তায় সমাহিতকরণ ইত্যাদি এখনো একটা সংস্কারের মত করে মেনে চলা হয়, অনেকটা এই ভেবে যে এসব থেকে হারাবার কিছু নেই, বরং কোন লাভ হলেও হতে পারে।

এছাড়া জাঁক-জমকপূর্ণ বড়দিনের মৌসুমে অনেকেই, কিছু পুরানো, মূলতঃ কুসংস্কার বা নীচু ধর্মীয় বিশ্বাস [যেমন মূর্তি উপাসনা] উদ্ভূত রীতি-নীতির সাথে নিজেদের আবেগের যোগসূত্র অনুভব করেন। অথচ ক্যাথলিক জার্মান চ্যান্সেলর Helmut Kohl যখন এই উপলক্ষে তার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন, তখন ঈশ্বর বা যীশুর নাম সাধারণতঃ উচ্চারণও করা হয় না। এভাবে মৌলিক খৃষ্টান সংকল্প এবং অনুশীলন, দুটোই কেবল মৌলবাদী ছোট ছোট উপদলের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে- যারা নীচে থেকে গীর্জার পুনরুজ্জীবনের ব্যর্থ চেষ্টা করে। পশ্চিমে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারানোকে, "প্রগতি" তে সীমাহীন বিশ্বাস স্থাপন দিয়ে পোষানো হয়েছে। পৃথিবী ক্রমেই আরো বেশী "আলোক প্রাপ্ত" এবং "যৌক্তিকতা" পূর্ণ, আরো বেশী মুক্তমনা এবং মানবিক হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়েছে। আমেরিকান জীবন যাত্রায় প্রতিফলিত ও আদর্শ লাভকারী, আধুনিকীকরণের এই প্রক্রিয়াকে, বাকী পৃথিবীকে পুনর্বিন্যাস করার বাধ্যতামূলক আদর্শ মডেল বলে অনেকে মনে করেছিলেন এবং এখনো করছেন।

একটা ধর্মহীন বিশ্বে, একজন গড় পশ্চিমা নাগরিক-তা তার শিক্ষাগত যোগ্যতা যাই হোক না কেন-পশ্চিমা জীবনধারার বিকল্প কোন জীবনধারা, কল্পনাও করতে পারে না। আজ হোক আর কালই হোক; সে আশা করে,"সবাই জিন্স পরবে, হ্যামবার্গার খাবে,

www.amarboi.org

Coca Cola পান করবে, Marlboro সিগারেট খাবে, CNN দেখবে, সংসদীয় গণতন্ত্রের নাগরিক হিসেবে Bauhaus আকারের অট্টালিকায় বাস করবে এবং কোন একটা খৃষ্টান চার্চের নথিভুক্ত সদস্যও হবে।"[১৯]

১৯৯০ সালের দিকে, সমাজতন্ত্রের ধ্বস্ নামার পর এই ভাবধারা বিশেষতঃ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের নীতি-নির্ধারণী কর্মচারীদের প্রধান Francis Fukuyama কে ১৯৯১ সালে তার প্রবন্ধ (পরে বই) The End of History`` বা "ইতিহাসের সমাপ্তি" লিখতে উৎসাহিত করে। পশ্চিমা ধাঁচের এক বিশ্ব ব্যবস্থার-এই নতুন চিন্তাধারার বক্তব্য ছিল খুব পরিষ্কার: কেবল মাত্র পশ্চাদপদ দেশসমূহ হয়তো কিছু সীমিত সময়ের জন্য যুক্তিবাদ, মুক্ত মানসিকতাবাদ, সহিষ্ণুতা, সংসদীয় ব্যবস্থা ও মানবাধিকার সম্বলিত পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গীর নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে অক্ষম হতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে: পশ্চিমা জগত সাধারণভাবে এমন আশাই করে যাবে যে, আমেরিকান জীবনধারা ভৌগলিক প্রভাব বিস্তার করবে এবং একদিন তা পৃথিবীর সবার জীবনধারায় পরিণত হবে।

এটা একটা ছোঁয়াচে ভাবধারা, যা সবদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। যখন Hans Kung ভৌগলিক নৈতিকতার অথবা Wilfried C. Smith "ভৌগলিক ধর্মতত্ত্বের" ডাক দেন, তখন আমার মনে হয়, তাদের মনে এমনি নৈতিকতা বা ধর্ম-দর্শনের চিন্তা থাকে, যেগুলো কৃত্রিম বিশ্ব-ভাষা Esperanto র মতই- মূলতঃ পশ্চিমা বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে গঠিত।[২০] এখানে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই: তৃতীয় বিশ্ব এখন বর্ণবাদের সোচ্চার কণ্ঠযুক্ত[২১] এক পশ্চিমা "সর্বগ্রাসী সার্বিক-সমাজ ব্যবস্থা"র[২২] মুখোমুখি।

ইসলামী বিশ্ব যদি, এই ধরনের এক অভিন্ন সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত না হতে চায়, তবে একবিংশ শতাব্দীতে তাদের একটি "দারুল ইসলাম" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্রোতের প্রতিকূলে গিয়ে পাহাড় পরিমাণ পরিশ্রমের যোগান দিতে হবে- যে "দারুল ইসলাম" ইউরোপকেন্দ্রিক না হয়ে হবে "ঈশ্বরকেন্দ্রিক"- একটা সমাজ ব্যবস্থা যেখানে আল্লাহ্‌র বাণীই হবে আইন এবং যেখানে ইসলামী সভ্যতা আবার বিকশিত হবে।

একটা পৃথিবী, যেখানে মুসলমানরা নাগরিক হিসেবে নয়, বরং বিশ্বাসী হিসেবে এবং একটি একক উম্মার সদস্য হিসেবে বসবাস করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে- একটা পৃথিবী, যেখানে সত্যিকার মুসলমানরা এমন ভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার করবে, যাতে তা মানবতা হরণ না করে- একটা পৃথিবী, যেখানে সকল প্রশংসা এবং আনুগত্য, কেবল মাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার-ই প্রাপ্য-রূপ, সৌন্দর্য্য, তারুণ্য, ক্ষমতা, যৌনতা, অর্থ, জনপ্রিয়তা, পদমর্যাদা ও বিনোদনের মত সমকালীন আরাধ্য দেবতাকুলের প্রাপ্য নয়। অর্থনীতি ও উন্নততর প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ: দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা, প্রবৃদ্ধি এবং সর্বোচ্চ মুনাফার নিশ্চয়তা- এসব দিয়ে যে পৃথিবী নির্ধারিত হবে না বরং এসব ছাপিয়ে মানুষ এবং তার শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক প্রয়োজনই হবে যার প্রধান বিচার্য্য বিষয়।

www.amarboi.org

সোজা কথায় বলতে গেলে, বর্তমান পৃথিবী, যা কিনা চাল-চলনের বা আচার-আচরণের ব্যাপারে সর্বগ্রাসী এক একত্রীকরণের দাবী রাখে- এই পৃথিবীতে থেকেও, আমরা মুসলমানরা যদি আমাদের মত থাকতে চাই, আমাদের "সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ" অধিকারকে যদি সংরক্ষণ করতে চাই, তবে বৃহত্তর জিহাদের ক্ষেত্রে (নিজেদের শুদ্ধ করার যে জিহাদ), আমাদের বিরাট অবদান রাখতে হবে। আমরা যেমনটি খানিক পরে দেখতে পাবো- এর জন্য প্রয়োজন হবে, "ইসলামী চিন্তাধারার পুনর্গঠন"[২৩] এবং আধুনিকতা উত্তর সময়ের পরিবর্তনের যে বিশাল ঢেউ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে: শিক্ষাক্ষেত্রে, যোগাযোগ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, আইনে, অর্থনীতিতে এবং প্রযুক্তিতে এসে প্রবল ধাক্কা দেবে-তাকে প্রতিহত করে টিকে থাকার মত ব্যাপক অনুশীলন [ধর্মীয়]।

অল্প কথায় "নামমাত্র মুসলিমকে" পুনরায় মনে-প্রাণে এবং কাজে-কর্মে মুসলিম হতে হবে। শেষ উপায় হিসেবে, এই ধর্মে জন্ম গ্রহণকারীদেরও আবার একই ধর্মে পুনঃ ধর্মান্তরিত হবার বিকল্প নেই।

মিঃ Fukuyama র সুপারিশ করা মতবাদের মত ভাবধারাসমূহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে সমান অবস্থানের ভিত্তিতে কোন সংলাপের অবকাশ রাখে না। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে, আদৌ কোন সংলাপের অবকাশ নেই। অবিশ্বাসী ধর্মনিরপেক্ষতা কেনই বা ইসলাম ধর্মের সাথে সমঝোতায় আসবে?- বিশেষতঃ এই ধর্মনিরপেক্ষতা, ইতিমধ্যেই যেহেতু, খৃষ্টধর্মকে অনায়াসে সমাজ সেবামূলক একটা প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

নিজেদের কর্মসূচি থেকে একবার সফলভাবে বাদ দেয়ার পর, অতিজাগতিক বা স্বর্গীয় বিষয়সমূহ নিয়ে, পাশ্চাত্য কেনই বা মুসলমানদের সাথে পুনরায় আলোচনার অবতারণা করতে যাবে ? অনেক মুসলমানদের মতই, তৃতীয় বিশ্ব যখন উৎফুল্ল চিত্তে পশ্চিমা মিশ্র সাংস্কৃতিক বিকৃতির দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তখন পাশ্চাত্য কেনই বা তৃতীয় বিশ্বের সংস্কৃতিকে ধর্তব্যের মাঝে আনবে ?

একজন পশ্চিমা পর্যটক যখন তথাকথিত মুসলিম দেশসমূহে মদ ও শুকরের মাংস, অশ্লীল ছায়া-ছবি, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের লটারী এবং ১৪% সুদে সরকারি ঋণ ইত্যাদি সবই দেখতে পায়- যখন সে দেখতে পায়, যে, তথাকথিত মুসলিম দেশসমূহে পশ্চিমা দিনপঞ্জিকা অনুসরণ করা হচ্ছে, খৃষ্টানদের মত শনিবার অর্ধেক ও রবিবার পূর্ণ সাপ্তাহিক ছুটির দিন মেনে চলা হচ্ছে এবং বেশীর ভাগ মসজিদই ফাঁকা পড়ে থাকছে- তখন নিজ দেশে ফিরে সে যদি অতিথি শ্রমিকদের হালাল মাংসের দাবী করতে দেখে, তবে তা তার কাছে হাস্যকরই মনে হবে, আর তা সে কেনই বা গুরুত্ব দেবে? উপকথার বিষয়বস্তুর মত, কখনো কখনো আযানের ধ্বনি শোনা গেলেও, একজন পর্যটকের চোখে কি Izmir বা Istanbul কে নব্য পৌত্তলিক বা ধর্মহীন নগরীই মনে হবার কথা নয় ?

গণমাধ্যমে যে উত্তর-দক্ষিণ সংলাপের কথা বলা হয়, যে কোন বিচারেই তা একটা একতরফা ব্যাপার, কেননা গণমাধ্যমের খেলায় উত্তর অনেক আগেই জয় লাভ করে বসে

www.amarboi.org

আছে। এর থেকে মুসলমানদের পাইকারী হারে আরো বেশী করে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা আত্তীকরণের উদ্ভব ঘটেছে- যা এখন তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে -যাকে occidentosis নামক এক মহামারী বলে উল্লেখ করা হয়।

গত শতবর্ষের দুর্ভাগ্যজনক এবং ধ্বংসাত্মক ঘটনাবলীর দিকে চেয়ে দেখলে, এটা বিশ্বাস করতে বেশ কষ্ট হয় যে, সীমাহীন প্রগতিতে পশ্চিমা জগতের যে নির্বোধ আস্থা, তা এখনো বহাল রয়েছে।

গ্যাস গ্রেনেড, আনবিক বোমা, আর, এখনো বৃটেনে স্মৃতিস্তম্ভের মাধ্যমে সম্মান জানানো, বৃটিশ জেনারেল Bomber-Harry কর্তৃক যে ভাবে কৌশলগত বোমাবর্ষণ ইত্যাদি "ব্যবহার" করে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেল- তারপরে কি এখনো কারো সত্যি বুঝতে অসুবিধা থাকতে পারে যে, যুক্তিবাদ ও মানববাদের ওপর ভিত্তি করে ফরাসী বিপ্লব উত্তর আলোকপ্রাপ্ত যে শাসন আমল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে? [জানা আবশ্যক, জার্মানীর Dresden শহরের নিরীহ বেসামরিক মানুষের উপর ঐ "কৌশলগত বোমা বর্ষণ" করা হয়েছিল], সোভিয়েত ইউনিয়নে Stalin তার নিজের জনগণের উপর যে অপরাধ সংঘটিত করেছিলেন, [অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞের] অথবা নাৎসী জার্মানীতে ক্যাম্পসমূহে ইহুদীদের উপর যে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছিল, পৃথিবী তার চেয়ে নিম্নমানের কোন অপরাধ কি কোথাও সংঘটিত হতে দেখেছে? তাপাণবিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ঝুঁকির মুখে, পারস্পরিক অস্ত্র সংযমের কৌশলকে কি যুক্তিযুক্ত মনে হয়? আমাদের এই গ্রহকে পরিবেশ ধ্বংসের দিকে আমরা যে ভাবে ঠেলে দিচ্ছি তাকে কি প্রগতি বলা যায়? আমি এভাবে আরো উদাহরণ দিয়েই যেতে পারি, কিন্তু আমি তা করবো না।

আধুনিক যুক্তিবাদের এই দ্বন্দ্ব থেকে পশ্চিমা চিন্তাবিদরা অনায়াসেই একটা উপসংহারে পৌছাতে পারতেন- কিন্তু খুব কম সংখ্যকই সেদিকে চেয়ে দেখেছেন- তারা এই সিদ্ধান্তে পৌছাবেন যে, কেবল যুক্তিবাদী অর্ন্তদৃষ্টি অথবা আবেগাপ্লুত মানবিক অনুভূতির উপর ভিত্তি করে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না; গত শতাব্দীর ঘটনাবলী থেকে তাই প্রমাণিত হয়েছে। কোন ব্যক্তি বা এমনকি, সাধারণ মানুষ কর্তৃক আদৌ যদি নৈতিক মূল্যবোধের উপর জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার কোন সম্ভাবনা থেকে থাকে, তবে তা কেবল এবং কেবল মাত্রই আল্লাহর নৈতিক আদেশসমূহের কাছে মানুষের আত্মসমর্পণের মাঝে রয়েছে।

এটা একটা গতানুগতিক ব্যাপার যে, কোন একটা বৈজ্ঞানিক ধারণা বা প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচিত হবার শতবর্ষ বা তারও বেশী দিন পরে, তা এক ধরনের প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হয়ে যায় এবং প্রায়শঃই এক বিষাক্ত জনপ্রিয় রূপধারণ করে তা জনমনে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তাই , এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই যে, পাশ্চাত্যের সাধারণ সমকালীন নাস্তিক বা অবিশ্বাসী এখনো, গর্ব ভরে, উনবিংশ শতাব্দীর সেকেলে ও বাতিল দর্শনসমূহ অনুসরণ করে থাকে- আর একই সঙ্গে তারা খুব নিকট অতীতের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলাফল, যা ঐ সমস্ত পুরাতন ধ্যানধারণার বিরোধিতা করে--সেগুলোকেও অবজ্ঞা করে থাকে। এই সত্যটা বিশেষভাবে, মাইক্রো ও ম্যাক্রো পদার্থবিজ্ঞান এবং মস্তিষ্ক-সম্বন্ধীয় গবেষণার বেলায় প্রযোজ্য।

www.amarboi.org

বৃটিশ মহাকাশ বিজ্ঞানী Stephen Hawking[২৫] এর মত বিশেষ এবং লক্ষণীয় ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিলে আজকের পৃথিবীর কত সংখ্যক অত্যন্ত উঁচু শ্রেণীর পদার্থ-বিজ্ঞানী, জীব-বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ যে মহাবিশ্বের একজন অত্যন্ত জ্ঞানী সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন- তা জানতে পারলে, অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত "বুদ্ধিজীবি" নাস্তিকই স্তম্ভিত হয়ে যেতেন।[২৬]

সৃষ্টির দর্শনকে পুনরায় স্বীকার করে নিয়ে, পদার্থবিজ্ঞান যেভাবে এক আধুনিকতা উত্তর বিজ্ঞানের রূপ নিয়েছে, সেই প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিলেন Quantum theory- র প্রবর্তক Max Planck (খৃঃ ১৯৪৭), আপেক্ষিক তত্ত্বের সূত্রের প্রবর্তক Albert Einstein (খৃঃ ১৯৫৫) এবং Werner Heisenberg (খৃঃ ১৯৭৬) - যিনি অনিশ্চয়তার নীতি বা Uncertainty Principle -এর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন (একথা আবিষ্কারের পর যে, একটা ইলেক্ট্রনের গতি এবং অবস্থান একই সাথে নির্ণয় করা সম্ভব নয়)।

আধুনিক পদার্থবিদ্যা ও অংকশাস্ত্রের এই সব বিশাল ব্যক্তিত্ব, আর Neil Bohr, Max Born, Aurther Edington & Erwin Schroder এর মত তাদের সহকর্মীগণ পদার্থ, কারণ ও প্রতিফল, সময় ও ক্ষেত্র ইত্যাদির গতানুগতিক ধারণাসমূহকে বলতে গেলে তছনছ করে দিয়েছেন এবং সেই সুবাদে বিজ্ঞানের জগতে ধর্মের প্রবেশদ্বার পুনরায় খুলে দিয়েছেন। "Probability Theory of God" বা ঈশ্বরের সম্ভাব্যতার সূত্র" যার মতে-ঈশ্বর না থাকাটা সাংঘাতিক রকম অস্বাভাবিক-এই সূত্রের মাধ্যমে Richard Swinburn[২৭] উপরোক্ত বিজ্ঞানীদের জন্য উপসংহার তৈরী করেছেন।

Carl Friedrich Von Weizsacker সহ উপরে উল্লেখিত পদার্থ-বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই, দর্শনের ভাষায়, Plato উত্তর আদর্শবাদীতে পরিণত হয়েছেন- যারা বিশ্বাস করেন যে, একটা আধ্যাত্মিক জগত বা মাত্রা রয়েছে এবং সম্ভবতঃ একমাত্র সেটাই কেবল বাস্তব, বাকী সব কিছু আপেক্ষিক।[২৮]

আমি অবশ্য এমন ইঙ্গিত দিতে চাই না যে, এই বিপ্লব চুপিসারে, সাধারণ মানুষের অগোচরেই ঘটে গিয়েছে। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ যা বুঝেছে তা "সবকিছুই আপেক্ষিক" বা "সব অনুভূতিই ব্যক্তিগত/ব্যক্তি নির্ভর" এবং "মানুষের যুক্তি কেবল তার নিজের সীমাকেই নির্ধারণ করতে সক্ষম"-যে সীমা তার ইন্দ্রিয়ের সীমাসমূহের নামান্তর-এই ধরনের ধ্যানধারণাতেই সীমাবদ্ধ-যে দিকে David Hume (Enquiry concerning Human understanding), Immanuel Kant (Kritik der reinen Vernunft) এবং Ludwig Wittgenstein (Tractatus logico-philosophicus) তাদের নিজ নিজ সময়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে গেছেন।

আসলে ঠিক মত না বুঝতে পারলে, আধুনিক পদার্থবিদ্যা থেকে যেমন Abu Hasan al Ashari র মত মানুষের নম্র অথচ জ্ঞানসমৃদ্ধ অনুসিদ্ধান্তে পৌছানো যায় না, তেমনি এই সাধারণ স্বীকৃতিতেও উপনীত হওয়া যায় না যে, মহাবিশ্বের সূচনালগ্ন তথা পৃথিবীতে জীবনের

www.amarboi.org

উদ্ভব সংক্রান্ত আমাদের সর্বশেষ জ্ঞান কিভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয়ক কোরআনের আয়াতসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আধুনিক মানুষ বরং Marxism, Darwinism এবং Freudianism এর ব্যর্থতার মাঝে তার সন্দেহবাদ, অবিশ্বাস এবং ব্যক্তিবাদের স্বীকৃতিই দেখতে পেয়েছে। যেমনটি দার্শনিক Jurgen Habermas বলেছেনঃ "আধুনিক নৈতিকতা" ব্যক্তিনির্ভরতার নীতি'র (Principle of Subjectivity) মাঝে বাস্তব রূপ লাভ করেছে।[২৯]

আরেকভাবে বলতে গেলে: মানুষ এক ধরনের ভ্রান্ত-ধর্মীয় ধারণা থেকে এখনো বিশ্বাস করে চলেছে যে, বিজ্ঞানের বাইরে কোন নাজাত বা পরিত্রাণ নেই এবং একই সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর জরাজীর্ণ বা সেকেলে বস্তুবাদকেও নির্ভুল বিজ্ঞান বলে ভুল করে চলেছে।

জীবনে শূন্যতা, অর্থহীনতা এবং কোন মহৎ উদ্দেশ্য না থাকার ক্রমবর্ধমান অনুভূতি থেকে, তাদের সমাজের উপর যে অভিশাপের ছায়া নেমে এসেছে, এসম্বন্ধে পশ্চিমা জনমানুষের অসচেতনতা সত্যিই পীড়াদায়ক- অনেকেই বুঝতে অক্ষম যে, আধ্যাত্মিক চেতনার বিপদজনক শূন্যতা কিভাবে মানুষের ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে এক অর্থহীন বোঝায় পরিণত করে। Parvez Mansoor ঠিক যেমনটি বলেছেনঃ ***"পশ্চিমা মানস" তার নাস্তিকতার মূল্য পরিশোধ করতে চলেছে।***

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যেন এমনটি কেউ ভেবেই দেখেননি যে, পশ্চিমা নৈতিকতার অবক্ষয় ও একাত্মতার অভাব থেকে স্বাভাবিক ভাবেই অপরাধ, মদাসক্তি, নেশাগ্রস্ততা, উন্মুক্ত ও সোচ্চার সমকামিতা, শিশু নির্যাতন, বিবাহ-বিচ্ছেদের গগনচুম্বী হার, পশুসুলভ পর্নোগ্রাফি এবং নাগরিক বোধসমূহের অভাব ইত্যাদির উদ্ভব ঘটবে-এসবই ক্ষয়িষ্ণুতার স্বাভাবিক উপসর্গ। এসবের মাঝে নিকৃষ্টতম বুঝিবা তরুণ-তরুণীদের একা থাকার প্রবণতা। পিতৃহীন বা পিতৃবিহীন শিশুদের একটা গোটা প্রজন্ম বেড়ে ওঠার সাংঘাতিক বিপদ এবং ক্ষতির সঠিক মূল্যায়ন এখনো কারো পক্ষে করা সম্ভব হবে না।

নিশ্চয়তা হারিয়ে ফেল্‌লে, চিত্তে যে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়, তা থেকে নৈতিকতার এই জটিলতা ও মানসিক হাহাকার আরো তীব্র রূপ ধারণ করে। মানুষ অনুধাবন করে যে, ইতিহাস ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী রূপ ধারণ করে না। সমাজতন্ত্রের পতনের পর পর, পশ্চিমা সভ্যতার জয়জয়কার সম্বলিত একটা স্বল্পস্থায়ী অধ্যায় সূচিত হয়েছিল। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই সবাই দেখলেন যে, চিরস্থায়ী শান্তির নতুন বিশ্বব্যবস্থায় পদার্পণ না করে, পৃথিবী বরং উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদ ও মারমুখী দেশাত্মবোধে ফিরে যাচ্ছে- যার পরিণতিতে ক্রয়েশিয়া ও বস্‌নিয়ার বিরুদ্ধে গ্রীক গোঁড়া খৃষ্টান তথা কম্যুনিষ্ট সার্বিয়া বর্বর যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল এবং একই ভাবে ককেসাস্ অঞ্চলের মুসলমানদের বিরুদ্ধে রাশিয়া তার বর্বর আক্রমণ চালিয়েছিল।

ক্রমবর্ধমান অতিরিক্ত ভোগবিলাসের প্রবণতা থেকে পরিবেশ যে ধ্বংসের দিকে ধেয়ে চলেছে, সে সম্বন্ধে তথাকথিত সভ্য/ উন্নত বিশ্ব সত্যিকার অর্থে কোন সমাধান দিতে অক্ষম- এই সত্যটা অনুধাবন করেও পৃথিবীর মানুষ আজ বিচলিত। পরিবেশ দূষণ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি- যেমন বড় বড় শহরের উপর ছেয়ে থাকা ধোঁয়াশা- কেয়ামতের আভাস দেয়।

www.amarboi.org

কিন্তু লিপ্সা ও ভোগের প্রবৃত্তিকে সংযত করা যায় না। মূল্যবোধের অবক্ষয়, ইতিমধ্যেই পশ্চিমা ইচ্ছা-শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে। আর আজ তাই, কেবল পরিবেশ সচেতনতা, একটা আপাতঃ ধর্ম হিসেবে সত্যিকার ধর্মের নীতিনির্ধারক ও অনুপ্রেরণাদানকারী কার্যকারিতার স্থান দখল করতে পারে না- পারে না কোন নতুন মূল্যবোধের জন্ম দিতে, যা বিশ্বে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারে।

www.amarboi.org

৫ম অধ্যায়

ইসলাম ও পাশ্চাত্যঃ পুনরায় মুখোমুখি ?

পশ্চিমা নব্য সাম্রাজ্যবাদের ভাবধারাকে বা ইউরো-আমেরিকান সামন্তবাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে যদি আমরা ধর্মের প্রতি একেবারেই অসহিষ্ণু বলে আখ্যায়িত করি, তবে বোধ হয় সুবিচার করা হবে না। ধর্মের দর্শন বা বৌদ্ধ ধর্মের মত বিষয়ে, সবচেয়ে আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরও বরং, অনেক সময়েই, এক ধরনের সামাজিক আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যেতে পারে।

নিজের চাকুরী বা জীবনের কোন ঝুঁকি না নিয়েই, আজকাল ইউরোপে বা আমেরিকায়, কেউ কোন হিন্দু গুরুর শিষ্য হতে পারে অথবা আদিবাসী Red Indian দের Shaman যাদু বিদ্যার অনুশীলন করতে পারে। খৃষ্টান বিজ্ঞানীরা যেমনটি মনে করে থাকেন- যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম-কর্ম ব্যবসায় বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোন হুমকির কারণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা নিরীহ-বড় জোর ধর্মের আচার-আচরণকে সেকেলে বা অসংলগ্ন বলা যেতে পারে। কোন বর্ণাঢ্য রূপকথার মতই, সাধারণতঃ ধর্মের সাথে কারো যোগাযোগকে এক ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসেবে দেখা হয়। এক কথায় বলতে গেলে, মানুষজন Aquarian যুগের বেসরকারী মতবাদ অনুসরণ করে থাকে: যেখানে সবকিছুই চলে- কেবল যদি না ধর্মটা ইসলাম হয়। *আসলে, ইসলামই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যা সহিষ্ণুতা বা "চলছে তো চলুক" এ ধরনের মনোভাবকে গ্রহণ করতে পারে না বা তা নিয়ে নিশ্চিন্তে বসেও থাকতে পারে না।*

এই ধরনের একটা উদ্ভট পরিস্থিতির পেছনে অনেক জটিল কারণ রয়েছে। খুঁজতে গেলে কিছু কারণের মূল ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে খৃষ্টান মুসলিম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে এবং এই অঞ্চলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের সংঘাতের মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে।

ঐতিহাসিকভাবে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের মনে যে শত্রুতা রয়েছে, তার মূলে রয়েছে এই ধারণা যে, মুহাম্মদ (দঃ) একজন ভন্ড ছিলেন। খৃষ্টানদের চোখে মুসলমানদের শত্রু হিসেবে দেখার জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল। তবে এমন মনে করার ব্যাপারটা আমরা সহজেই বুঝতে পারি- ইতিহাসে সব সময়েই দেখা গেছে, একটা সম্প্রদায় তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণাকে সঠিক মনে করে সেটাই আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়- ঠিক যেমনটি যীশু খৃষ্টের আগমন সত্ত্বেও ইহুদীরা মূসা (আঃ) কর্তৃক প্রচারিত তাদের পুরাতন ধর্মবিশ্বাসে অটল থাকে। (ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে গিয়ে কি আবু সুফিয়ান এবং তার সতীর্থ মক্কাবাসীর এই একই যুক্তি ছিল না ?)

www.amarboi.org

কিন্তু , "ঈশ্বরের পুত্র যীশু" ক্রুশে আত্মাহুতি দিয়ে মানবকুলের জন্য নাজাতের পথ তৈরী করার ছয় শতাব্দী পরে, একটা নতুন ধর্মের জন্মটা খৃষ্টানদের কাছে কেবল একটা প্ররোচনা বলেই গণ্য হয়নি বরং একটা অপমানজনক ব্যাপারও মনে হয়েছে। মুসলমানদের অবশ্য এই ধরনের প্রতিক্রিয়ার কারণ বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কেননা, তারাও তাদের নবীকে শেষ আসমানী কিতাবের বাহক মনে করে (5:3) এবং পূর্ববর্তী সব কিতাবের শেষের মোহর বা বন্ধনী (al khatim) বলে মনে করে থাকে: মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীকুলের মোহর (33:40), তাই Druze বা Bahai গণের কাছে পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা এসেছে, একথা শুনলে মুসলিমদের মাঝে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তা অনেকটা তাদের ব্যাপারে খৃষ্টানদের প্রতিক্রিয়ার সদৃশ।

ক্রমবর্ধমান খৃষ্টান-বৈরীতার আরেকটি ঐতিহাসিক কারণ হচ্ছে খৃষ্টানদের এই অনুমান যে, ইসলাম হচ্ছে একটি মারমুখী এবং যুদ্ধপিপাসু ধর্ম যার বিস্তৃতি মূলতঃ ঘটেছিলো সামরিক অভিযানের মাধ্যমে, আর তাছাড়া, যে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ইসলামের প্রসার ঘটেছিল, তাই বা কি করে ব্যাখ্যা করা যায়? Hijaz থেকে উদ্ভূত ইসলাম ৬৬৮ সালে Constantinople, ৭১০ সালে ভারত এবং ৭৩৩ সালে মধ্য ফ্রান্সে বিস্তার লাভ করেছিল। আসলে খৃষ্টান জগত এই সত্যটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি যে, ইসলাম ঐ সমস্ত জনপদে এক ত্রাণকারী হিসেবে এসেছিল। সিজার ও পোপের চাপিয়ে দেয়া নিয়ম কানুন তথা Nicaea কাউন্সিলের ঘোষণা [যা ভিন্নমতাবলম্বী খৃষ্টানদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল] ইত্যাদির ভারে জর্জরিত জনমানুষ যে অসহ্য জীবন যাপন করছিল, সেই পটভূমিতে তারা ইসলামের জীবন দর্শনকে স্বাগতঃ জানিয়েছিল এবং পরবর্তীতে সেই ধর্ম বিশ্বাসই অনুশীলন করে যাচ্ছিল। যীশুখৃষ্ট ঈশ্বরের পুত্র নন- ইসলামের এই মতবাদ তাদের মনে ধরেছিল, আর তারা যে ভাবে বিভিন্ন মতের চার্চ ত্যাগ করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছিল, তাকে এক গণ-আন্দোলন বলেই অভিহিত করা যায়।

এছাড়া, কিভাবেই বা হাতে গোনা কিছু সেকেলে আরব বিভিন্ন সাম্রাজ্য জয় করেছিল? মুখ রক্ষা করতে গিয়ে, তাই আজও খৃষ্টান জগত এই স্বরচিত কাহিনী আকঁড়ে ধরে আছে যে, "ইসলামের প্রসার ঘটেছিল আগুন ও তরবারীর মাধ্যমে"।[৩০]

খৃষ্টানদের আরেকটি স্ব-উদ্ভূত প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই অপবাদ যে, মুহাম্মদ (সাঃ) একজন "ভন্ড" ছিলেন যিনি যীশুখৃষ্টের শিক্ষাসমূহকে (ভুল ভাবে) নকল করে সংকলিত করেছিলেন। উপরন্তু, তাঁর ধর্মের প্রতি জনমানুষের আকৃষ্ট হবার নেপথ্যে রয়েছে যৌনতার প্রতি একধরনের প্রশ্রয়- এটাও এক ধরনের খৃষ্টান কল্পকাহিনী-ইসলাম চার জন স্ত্রীর সাথে ঘর করার অনুমতি দেয়। আর এর নবী ছিলেন একজন লম্পট-যাকে পরবর্তীতে "Mahound" বলে ডাকবে খৃষ্টানরা (এবং Salman Rushdie এখনো তাই ডাকছে)। ***এভাবেই, ইসলামের প্রতি বৈরীভাব, ইউরোপীয় মনোবৃত্তির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়ায়।*** এভাবেই, ভ্রান্ত ধারণা থেকে জন্ম নেওয়া একধরনের বিস্ফোরক আবেগের

www.amarboi.org

ফলশ্রুতিতে জঙ্গী "Spirit of Crusades" বা ক্রুসেডের অনুপ্রেরণার সূত্রপাত- যা থেকে শেষ পর্যন্ত আধুনিক ইউরোপের জন্ম হয়।

খৃষ্টধর্মের প্রতিটি মহান আদর্শ ও স্বতঃসিদ্ধকে পদদলিত করে, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রথম বহিঃপ্রকাশ যে তথাকথিত ক্রুসেডসমূহের মাধ্যমে ঘটেছিল -ক্রুসেডের এই অবহেলিত দিকটি আজ আর আমাদের আগ্রহের সৃষ্টি করে না। [৩১] আজও পর্যন্ত, মুসলমানদের স্মৃতিতে ক্রুসেডসমূহের ক্রসের ছবিই জীবন্ত হয়ে আছে।

কিন্তু ক্রুসেড পরবর্তী প্রতিক্রিয়াসমূহের মাঝে, এই আবেগপ্রবণ ঐতিহ্যের চেয়েও, আসন্ন সময়ের জন্য অধিকতর বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর আরও কিছু প্রতিক্রিয়া ছিল- তা ছিল খৃষ্টান সমর-নায়কদের Cultural Shock-এর অভিজ্ঞতা- যখন তারা নিজেদের মনগড়া বর্বর "Saracen" দের পরিবর্তে, নিজেদের চেয়ে উন্নততর এক সভ্যতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। অনেক খৃষ্টান সমর-নায়কের কাছেই পবিত্র ভূমির স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা বেশ বিব্রতকর ছিল- তখনকার "প্রকৃত বর্বর"ইউরোপের কাছে অজানা এক পরিশোধিত এবং পরিশীলিত জীবনধরণ, শিক্ষার হার, চিকিৎসা বিজ্ঞান আর কুর্দী বীর সালাউদ্দিনের চরিত্রে সমন্বিত বীরত্ব, করুণা ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদির স্মৃতি তাদের কাছে পীড়াদায়ক ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের পুণ্যভূমিতে দেখে যাওয়া সভ্যতা ছিল অনেকটা মুসলিম Andalusia-র সভ্যতার মতই, যা তাদের খৃষ্টান প্রতিপক্ষকে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত করেছিল এমন বোধ দিয়ে যে, যদি কেউ তখন বর্বর থেকে থাকে তবে তা মুসলমানরা নয় বরং ক্রুসেড লড়তে আসা খৃষ্টানরাই।

ইউরোপীয়রা আজও এবং এখনো যে ইসলামকে ভয় করে, তার মূলে রয়েছে ঐ সমস্ত অভিজ্ঞতা-আর এই ভীতি চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছিল ১৫২৯ এবং ১৬৮৩ সালে, যখন তুর্কীরা Vienna অবরোধ করেছিল।

ক্রুসেডের অনুপ্রেরণা খৃষ্টান হৃদয় থেকে মুছে গিয়েছে বা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, এমন বিশ্বাস করাটা এক বিপজ্জনক কল্পনা বিলাস ছাড়া কিছুই নয়। এই তো ১৪৬৩ সালেও, সুলতান Mehmet -II Fatih -এর কাছে Constantinople এর পতনের প্রতিক্রিয়া দেখাতে, ঘটনার দশ বৎসর পরে Pope Pius II, তুর্কী Ottoman দের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ডাক দিয়েছিলেন।

তদুপরি, ১৪৯২ সালের পরে, মুসলিম স্পেনের পুনরুদ্ধার প্রকল্পে, সেখান থেকে সমগ্র ইহুদী এবং মুসলমান জনসংখ্যাকে বহিষ্কার করেই খৃষ্টানরা ক্ষান্ত হয়নি, বরং সেই সঙ্গে স্প্যানিশরা [খৃষ্টানরা] ভূমধ্য সাগরের পশ্চিম তীরে উত্তর আফ্রিকার উপকূলসমূহ দখল করার চেষ্টা করে এবং সেই সূত্রে Algiers, Ovan, Mellila, Ceuta তে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে।

ষোড়শ শতাব্দীতে, স্প্যানিশদের অনুকরণে, পর্তুগীজরাও মরক্কোর আটলান্টিক উপকূল দখল করার চেষ্টা চালায়। Azila, Larache, El-jadida, Safi এবং Es-Saouira -য় তাই তাদের ঘাঁটি দেখতে পাওয়া যেত। ১৫৭৮ সালে তরুণ পর্তুগীজ রাজা

www.amarboi.org

Sebastiao, মরক্কোকে পুনরায় খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার একান্ত চেষ্টা করেছিলেন। "Ksar el-Kebir-এর কাছে" Battle of the three kings বা তথাকথিত "তিন রাজার যুদ্ধে" পরাজয়ের মাধ্যমে পর্তুগীজ রাজার ক্রুসেডের সমাপ্তি ঘটে, আর সেই সঙ্গে তাঁর এবং তাঁর রাজ্যের ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে আসে। রাজা তাঁর জীবন হারান আর পর্তুগাল, স্প্যানিশ রাজ্যের কাছে তার উত্তর আফ্রিকার উপনিবেশ বা দখলকৃত ভূমি হারায়।[৩২]

মুসলিম জগতের প্রতি খৃষ্টানদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর ধারাবাহিকতায়ই বৃটিশ, ফরাসী, ইতালীয়, ওলন্দাজ এবং রুশীয় ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ কর্তৃক, উনবিংশ শতাব্দীতে, প্রায় সমগ্র মুসলিম জগতকেই উপনিবেশে পরিণত করা হয়। Maghrib বা পশ্চিমের Berber জনগোষ্ঠীকে পুনরায় খৃষ্টান বানানোর উদ্দেশ্যে, অধিকৃত তিউনিসে, The white fathers নামের বিশেষ মিশনারী প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। ক্রুসেডাররা যেভাবে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের Frankish রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তা পরিচালনা করেছিল, তার সাথে যেভাবে বৃটিশরা আমাদের এই শতাব্দীতে (বিংশ) প্যালেস্টাইনকে ইহুদীদের কাছে হস্তান্তর করেছে তার কি বিশেষ কোন পার্থক্য আছে? আসলে এই সব কিছুই মুসলিম বিদ্বেষের এক ধারাবাহিকতার সাক্ষ্য দেয়।

এই পটভূমি সম্পর্কে সচেতন থেকে যখন কেউ স্মরণ করবেন যে Anatolia পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে ১৯২২ সালে গ্রীক রাজা Constantine বা তার সেনাবাহিনী তুর্কী জমিনে পা রাখেন নি, বরং পা রেখেছিলেন নিকটবর্তী এমন এক ভূমিতে যেখানে (সিংহহৃদয়) ইংরেজ রাজা Richard I, তার ক্রুসেডের সময় অবতরণ করেছিলেন- যেখানে ১৯৯০ সালে তৃতীয় ক্রুসেড--- ; তখন আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ থাকবে না।

বসনিয়াতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সার্বিয়দের ধ্বংসযজ্ঞকে তাই, সার্বিয় এবং গ্রীক সংবাদ মাধ্যম উভয়েই ক্রুসেড আখ্যায়িত করে স্বাগত জানিয়েছে এই বলে যে, এই ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে অতঃপর ইউরোপের মাটি থেকে শেষ মুসলিমকে উৎখাত করা যাবে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি: *"পৃথিবীর মঞ্চে ধর্মীয় যুদ্ধের পুনরুত্থান ঘটেছে"*।[৩৩] আর বসনিয়াই এর শেষ নয়, তবে সর্ব সাম্প্রতিক ক্রুসেড। মানুষজন আবারো একে অপরকে জিজ্ঞেস করে থাকে, "ঈশ্বর কাদের পক্ষে রয়েছেন?" বাস্তব কথা হচ্ছে এই যে, *ক্রুসেড যুগের সমাপ্তি কখনোই ঘটেনি।*

মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাক আজ অবশ্য Pope এর কাছ থেকে নাও আসতে পারে-বরং আজ তা আসতে পারে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষ থেকে- যখন সেখান থেকে "একটি পতিত দেশকে (মুসলিম দেশ অবশ্যই)" বাঁচাবার জন্য আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের ডাক দেয়া হয় অথবা যখন অন্যের আগ্রাসনের শিকার একটি মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র আমদানীর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ইউরোপীয় মানসের উপর জমে থাকা আবরণকে কেউ একটু ঘষে মেজে সাফ করে নিলেই, তার মাঝে মুসলিম বিদ্বেষ আবিষ্কার করতে পারবেন-Vienna অবরোধের আতংক এখনো সেখানে বিদ্যমান-আর

www.amarboi.org

এসব কিছুকেই যে কোন সময়ে সহজেই পুনরুজ্জীবিত করে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যায়। গত বিশ বৎসর যাবত পশ্চিম ইউরোপেও ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটেছে।

ইহুদীদের বিরুদ্ধে অতীতে সংঘটিত ভয়ঙ্কর অপরাধসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে, আজ ইউরোপের অবশিষ্ট ইহুদী জনসংখ্যা নতুন অত্যাচার ও বৈষম্য থেকে মুসলমানদের তুলনায় অনেক নিরাপদ অবস্থানে রয়েছে। *কিন্তু সুপ্ত বর্ণবাদী অনুভূতি যখন Semite দের বিরুদ্ধে, আরবদের বিরুদ্ধে এবং ঐ Semite তথা আরবীয় ধর্মের অন্য অনুসারীদের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে তখন কি হবে?* ইতিমধ্যেই এমন একটা দিন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যে দিন ইউরোপের কোথাও না কোথাও কোন না কোন মসজিদ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়নি। উন্নত বিবেকের জনগোষ্ঠী দ্বারা, নিজেদের মাতৃভূমিকে মানব নামধারী তেলাপোকার সমষ্টি থেকে মুক্ত করার সংকল্পে কি এবার মুসলিমদের বিরুদ্ধে "Crystal night[৩৬]" উদযাপিত হবে?-ঠিক যেমনটি নাৎসী জার্মানীতে ইহুদীদের বিরুদ্ধে উদযাপন করা হয়েছিল ? আমার এই কথাগুলো অত্যুক্তি হলে কি ভালোই না হতো! আমি যে বিপদের আশঙ্কা করছি তা থেকে সবাই মুক্তি পেতো!

সে যা হোক, আমরা যেন কেবল অন্য পক্ষকেই দোষ না দিই। নিজেদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে একটা নেতিবাচক ভাবমূর্তি বজায় রাখতে, দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, মুসলিম জগতের প্রচুর অবদান রয়েছে। সর্বোপরি ইরান ও লিবিয়ায় ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা, আর আল্লাহর নাম নিয়ে Bathist ইরাক কর্তৃক কুয়েত আক্রমণের ঘটনা ইত্যাদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে পশ্চিমের বৈষম্যমূলক নেতিবাচক ধারণাকে আরো জোরালো করেছে। আমরা পছন্দ করি বা না করি--ব্যাপারটা যুক্তিসঙ্গত এবং তথ্য ভিত্তিক হোক বা না হোক-- পশ্চিমা জনগণের মনে ইসলামের প্রসঙ্গ উঠলে ধর্মান্ধতা, নিষ্ঠুরতা, অসহিষ্ণুতা, সন্ত্রাস, স্বৈরাচার, মানবাধিকার লংঘন ও জ্ঞানবিমুখতার মত নেতিবাচক বিষয়সমূহ আপনা আপনিই ভেসে ওঠে।

পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকের এই পৃথিবীতে এমন একটা মুসলিম দেশও খুঁজে পাওয়া মুশকিল, যেখানে ইসলামী অনুশাসন সম্পূর্ণভাবে মেনে চলা হয়। আর একটি সম্পূর্ণ কার্যরত ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মডেলও খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব যেটাকে সবাই সাদরে গ্রহণ করবে। এটাও অস্বীকার করার কোন অর্থ হয় না যে, মানবাধিকার বিষয়সমূহ নিয়ে নিঃসঙ্কোচ গঠনমূলক এবং অপরাধবোধহীন আলোচনা থেকে মুসলিম জগত নিজেদের বহুদিন যাবত দূরে সরিয়ে রেখেছে। (আমি নীচে এই সমস্ত এবং অপরাপর দুর্বলতা নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করবো।)

এসমস্ত কারণে, এই বাস্তবতাও অস্বীকার করার কারণ নেই যে, বর্তমানে ইসলামকে "আধুনিকতার বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত" বলে মনে করা হয়।[৩৭] সুতরাং Wilfred Cantwell smith যখন বলেন "শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, পশ্চিমের জনমানুষের মনে ইসলামের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা ও আবেগ লালিত হয়ে আসছে, সে তুলনায় সমাজতন্ত্র বিরোধী পশ্চিমা ভীতি ও তিক্ততা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং গৌণ[৩৮]" তখন তাকে সঠিকই বলতে হয়।

www.amarboi.org

বর্তমানে ইসলাম বিরোধী আবেগ বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। যার মধ্যে অবজ্ঞা, বৈষম্য ও মারমুখী বর্ণবাদী নাস্তিকতাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ স্বরূপ আমরা অবজ্ঞার ব্যাপারটাকেই প্রথমে বিশ্লেষণ করে দেখি। সর্বাধিক বিক্রীত বইয়ের তালিকায় স্থান পাওয়া Jostin Gaardner -এর Sofies World [৩৮] -এর মত প্রকাশনাসহ, দর্শনের ইতিহাসের উপর বহু পাঠ্য বই আমরা বছরের পর বছর প্রকাশিত হতে দেখি। কিন্তু বলতে গেলে এর কোনটাতেই, মুসলিম দর্শনকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি বা মুসলিম দর্শনের প্রতি কোন কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করা হয়নি। এর কোনটিতে হয়তো Ibn Sina বা Ibn Rushd এর উল্লেখ থেকে থাকতে পারে। কিন্তু তা কেবল তাদের ল্যাটিন নাম Avicenna ও Avevroes ব্যবহার করে এবং তাও, ক্যাথলিক পান্ডিত্যের উপর আলোচনার অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

Al Kindi, al Razi, al Faraabi, al Ashari, Mutazilah চিন্তাধারার জ্ঞানীগণ, al Ghazzale, al Suhrawardi এবং Ibn al Arabi র মত দর্শনের বিশাল ব্যক্তিত্বদের সাধারণতঃ এড়িয়ে যাওয়া হয়। অথচ একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, আজকের ইউরোপে যে গ্রীক ও হেলেনীয় ঐতিহ্য দেখতে পাওয়া যায়, তা মূলতঃ মুসলিম দার্শনিকগণ কর্তৃক ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংরক্ষিত ও বিকশিত গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের কল্যাণে এসেছে- যা মুসলমানরা পাশ্চাত্যকে উপহার দিয়েছিল বা বলা যায় পাশ্চাত্যের কাছে হস্তান্তর করেছিল।

Muslim Andalusia[৪০]র অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে যে প্রায়- অবিশ্বাস্য সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটেছিল, সে বিষয়ে অজ্ঞতা ক্ষমার অযোগ্য। অথচ সহজভাবে বলতে গেলে: ***ইসলাম এবং এর সভ্যতা সম্পর্কে অজ্ঞতাকে এখনো ইউরোপ বা আমেরিকায়, শিক্ষার অভাব বা জ্ঞানহীনতা বলে গণ্য করা হয় না।***

পাশ্চাত্য যে নিজেদের তথা অন্যান্য অমুসলিমদের ব্যাপার-স্যাপার এবং মুসলিম বিশ্বের বিষয়সমূহকে দ্বৈত মাপকাঠিতে বা double standard এ বিচার করে থাকে এটা স্পষ্ট এবং প্রমাণিত একটা সত্য। উদাহরণ স্বরূপ আমরা পশ্চিমা গণ-মাধ্যমগুলোর কথাই প্রথমে চিন্তা করি: মুসলিম বিশ্বের বাইরের কোন সন্ত্রাসী আক্রমণের কথা যখন খবরে প্রকাশ করা হয়, তখন "IRA চরমপন্থী" বা "ETA বিচ্ছিন্নতাবাদী"রা গ্রেনেড ছুঁড়ছে, এভাবে কথাটা প্রকাশ করা হয়- বিশেষণগুলো হয় একধরনের-কখনো কাজটা কোন "গোঁড়া ক্যাথলিক" করেছে বলে আখ্যায়িত করা হয় না। এমনকি ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে, Tokyo-র পাতাল রেলে বিষাক্ত Sarin গ্যাস ব্যবহার করে যে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়, তাকেও পশ্চিমা গণমাধ্যম কেবল "চরমপন্থী গোষ্ঠীর" কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে- কোন "ধর্মের গোঁড়া সমর্থক গোষ্ঠীর" বলে আখ্যায়িত করেনি। অপরদিকে, নিকট প্রাচ্য বা আলজেরিয়ায় যদি কেউ একটা গ্রেনেড ছুঁড়ে থাকে, তবে সেই কাজের দায় ভার "গোঁড়া মুসলিম" বা "মুসলিম মৌলবাদী"দের কাঁধে চাপানো হবে- এমনকি যদি বা কাজটা কোন আরব খৃষ্টানের বা নাস্তিক Bathist এরও হয়।

www.amarboi.org

আমার নিজের ব্যাপারটাই না হয় আমরা বিবেচনা করি। ১৯৯২ সালে, আমার বই Islam: The Alternative এর জার্মান সংস্করণ প্রকাশিত হবার কয়েক সপ্তাহ আগে, জার্মান গণ-মাধ্যমগুলো আমার বিরুদ্ধে এক "ঘৃণ্য প্রচারণা"র অভিযান চালায় এবং মরক্কোতে রাষ্ট্রদূতের পদ থেকে আমাকে প্রত্যাহার করে দেশে ডেকে পাঠানো হোক বলে দাবী তোলে। তারা অভিযোগ করে যে আমি নাকি পুরুষের একাধিক বিবাহ, মেয়েদের প্রহার এবং পাথর নিক্ষেপে শাস্তি, হাত ও পা কেটে ফেলে শাস্তি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে কথা বলেছি আমার বইতে- অথচ আমার বইটা তারা পড়েও দেখেনি একবার যে তাতে কি আছে। (Salman Rushdie কে মুরতাদ বলার আগে তার বইটা অন্ততঃ পড়ে দেখা হয়েছিল)।

গণ-মাধ্যমগুলো কতগুলো বাঁধাধরা ধ্যানধারণার বেড়াজালে আটকা পড়ে আছে বলে মনে হয়-বিশেষতঃ তারা যখন কোন গোলযোগের সাথে, ইসলামকে, একটা ধর্ম হিসেবে, সম্পৃক্ত করে-তাদের ভাব-সাবে মনে হয় যেন অপরাপর ধর্মীয় গোষ্ঠীর চেয়ে হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতি ইসলামের একটা স্বাভাবিক আসক্তি রয়েছে। ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসাইনের কার্যকলাপকে যখন "একজন মুসলমানের" কার্যকলাপ বলে ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তখন আমরা এমন একটা লেখা খুঁজে পাই না কেন যেখানে সোভিয়েট ইউনিয়নে গগনচুম্বী অপরাধ সংঘটিত করার জন্য "গোঁড়া খৃষ্টান স্ট্যালিন" কে অভিযুক্ত করা হয়েছে অথবা নাৎসী জার্মানীতে সংঘটিত অপরাধের জন্য "ক্যাথলিক এডল্‌ফ হিটলার"কে অভিযুক্ত করা হয়েছে?

মুসলমানদের প্রসঙ্গ না ওঠা পর্যন্ত, পশ্চিমা মিডিয়া তাদের খৃষ্টান পরিচিতিকে উহ্য রেখে থাকে। মুসলমানদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের পেছনে রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা দেখতে পায় না তারা- বরং সেসবের পেছনে ধর্মীয় আদেশ ও সংকল্প আবিষ্কৃত হয়ে যায়। আসলে সত্যিই কি কেউ এই সত্য উদঘাটন করতে ইচ্ছুক যে ইতিহাসে কাদের অধ্যায় বেশী রক্তরঞ্জিত ? খৃষ্টানদের না মুসলমানদের ?

বর্তমান সময়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্য সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে। পশ্চিম ইউরোপে ফ্ল্যাটসমূহকে পরিবর্তিত করে বা পরিত্যক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পরিবর্তিত করে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা যাবে বহু জায়গায়। কিন্তু যখনই মুসলমানরা মিনার এবং গম্বুজ সমেত সত্যিকার একটা মসজিদ নির্মাণ করতে চেয়েছে, তখনই তাদের একটা আইনের যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তা Lyon বা Essen যেখানেই হোক। হঠাৎ করেই দেখা যাবে যে, শহরের গুরুজনদের কাছে তুর্কী ধাঁচের মসজিদের মিনারের চেয়ে, বায়ু দূষণকারী ধোঁয়ার স্তম্ভও যেন অধিকতর সৌন্দর্যবর্ধক বা সহনীয় বলে মনে হতে শুরু করে। কেউ কেউ তো এমন তর্কও জুড়ে দেন যে, ইউরোপের প্রাণকেন্দ্রের পটভূমিতে মসজিদের উপস্থিতির ব্যাপারটাই বেমানান। (বসনিয়া থেকে সৌন্দর্য্য বোধের খাতিরেই কি পরিকল্পিত ভাবে, একের পর এক মসজিদ ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হচ্ছে?)

www.amarboi.org

মিনারের প্রতি মিটার উচ্চতার জন্য মুসলমানদের দর কষাকষি করতে হয়- কি অযৌক্তিক এবং হাস্যকর ব্যাপার-তাদের এমন কথাও দিতে হয় যে কোন মুয়াজ্জিন ঐ মিনার কখনো ব্যবহার করবেন না, যাতে পরিবেশের ও প্রতিবেশের শান্তি ও নীরবতা বিঘ্নিত না হয়। চার্চের ঘন্টা যে, যে কোন সময় বেজে উঠতে পারে, এমন কি ভোর রাত্রেও- তার সাথে আযানের ধ্বনির শান্তিভঙ্গের যুক্তি মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমনটি একটা ওলন্দাজ ব্যঙ্গচিত্রে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে- আল্লাহু আকবরের পরিবর্তে যদি নামাজের ডাক দিতে "bim-bam bim-bam" জাতীয় ধ্বনি প্রচার করা হতো, তবেই বুঝি তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য হতো?

ইউরোপে, অবশিষ্ট ক্ষুদ্রাকার ইহুদী সম্প্রদায় যদি ধর্মীয় কারণে নিজেদের রীতি নীতি অনুযায়ী পশু জবাই করতে চায়, তবে তাদের অতি অবশ্যই তার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু যদি মুসলমানদের বিরাট জনগোষ্ঠীও হালাল মাংস সংগ্রহ করতে একই ধরনের সুযোগের আবেদন করে, তবে নানা রকম আইনের দোহাই দিয়ে তাদের অতি অবশ্য প্রত্যাখ্যান করা হয়।

বৈজ্ঞানিক মহলেও তেমনি একটা double standard বা দ্বৈত মাপকাঠি চালু আছে। বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, গত কয়েক দশক ধরে এমন অলিখিত নিয়ম চালু রয়েছে যে, যে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে, রাজনৈতিক ভাবে যা কিছুকে সঠিক মনে করা হয়, তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এভাবে একজন জীববিজ্ঞানী তার পেশাজীবনের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারেন, যদি তিনি ভুলে Darwin এর বিবর্তন-তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করেন বা তিনি যদি মেধার বংশানুক্রমিক দিকের উপর তার গবেষণাকে জোরদার করেন। একই ভাবে একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, তার পেশা জীবনে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারেন, যদি তিনি আমেরিকার সাথে ইসরায়েলের কৌশলগত মিত্রতা এবং তা থেকে উদ্ভূত পক্ষপাতিত্বকে প্রশ্ন করেন।

এই সমস্ত "রাজনৈতিক ভাবে সঠিক এবং নিরাপদ" মানুষদের কখনো "মৌলবাদী" বা "সেকেলে মূর্খ" বলে অভিযুক্ত করা হয় না-- যদিওবা তাদের জনপ্রিয় (তথা গোঁড়া) দৃষ্টিভঙ্গী, কেবল মাত্র সনাতন অনুমান-ভিত্তিক বিধিনিষেধের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়ে থাকে। অথচ একজন মুসলিম বিজ্ঞানী যদি এই ধারণা থেকে অগ্রসর হতে থাকেন যে, কিছু কিছু মূল্যবোধ (কোরআনের) চিরকালের জন্য প্রযোজ্য, তবে তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টার উদ্ভব হবে।

রাজনৈতিক বিষয়সমূহের বেলায়, ভিন্ন ক্ষেত্রে যখন ভিন্ন মাপকাঠি প্রয়োগ করা হয়, তখন মুসলমানরা তিক্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নিরাশ হয়ে যাওয়া আরবরা তাই আন্তর্জাতিক (সম্পর্কের) আইনকে, প্রায়ই, "blond and blue-eyed" বা "সোনালী চুল ও নীল চোখ" সম্পন্ন বলে আখ্যায়িত করে থাকে। *সার্বজনীন বা বিশ্বজনীন নিয়ম যে আদতে সার্বজনীন নয়, এই সত্যটা যথাযথ বিরক্তি ও ঘৃণা সহকারে তারা এভাবে অন্যদের বোঝাতে চেষ্টা করে।*

www.amarboi.org

উদাহরণ স্বরূপ ধরুন, একটা দেশের সামরিক জান্তা, একজন খৃষ্টান মৌলবাদী অথচ নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অনিচ্ছুক (Haiti)। এক্ষেত্রে জাতিসমূহের সমন্বয়ে গঠিত তথাকথিত জাতি-পরিবার (জাতি সংঘ?) ঐ সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে একত্রিত হবে এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত গোষ্ঠীর পক্ষ অবলম্বন করে তারা ব্যাপারটাতে হস্তক্ষেপ করবে। অথচ একই ধরনের একটা নির্বাচনে যদি একটা মুসলিম "মৌলবাদী" দল জয়ী হয় (Algeria), তবে তাদের প্রতিক্রিয়া একদম ভিন্ন হতে পারে। এই ক্ষেত্রে জাতি-পরিবার কর্তৃক সামরিক জান্তাকে বরদাস্ত এমনকি সমর্থন করার সম্ভাবনাই বেশী- কারণ দু'টো খল চরিত্রের ভিতর সামরিক জান্তাকে অপেক্ষাকৃত কম দুষ্ট বলে মনে হবে তাদের (বলা বাহুল্য, যে কোন মাত্রারই হোক না কেন, ইসলামই সব সময় তাদের কাছে নিকৃষ্টতর)।

অথবা আমরা না হয় আরেকটা উদাহরণ বিবেচনা করি- ধরুন, একটা দেশ (ইরাক), তার প্রতিবেশী দেশকে (কুয়েত) সামরিক ভাবে দখল করে নিয়ে নিজের মানচিত্রে সংযোজনের চিন্তা ভাবনা করছে। এক্ষেত্রে জাতি সংঘ, NATO ইত্যাদি সংঘবদ্ধভাবে এবং প্রয়োজনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে বিরাট সামরিক শক্তি নিয়ে দখলকৃত দেশকে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে হস্তক্ষেপ করবে। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ঐ দুর্বল দেশের সীমারেখা নিশ্চিত করা হবে যদি না ঐ দেশটি Palestine বা Bosnia-র মত কোন তেল-সম্পদ বিহীন মুসলিম দেশ হয়।

সার্বরা যদি কেবল মুসলিম হতো, তবে বসনিয়া হার্যিগোভিনায় তারা যে জাতিগত নিধন চালিয়েছে এবং যে ধরনের যুদ্ধ-অপরাধ সংঘটিত করেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্ররা যে সর্বাত্মক সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাদের ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতো, সে সম্বন্ধে কি কারো সন্দেহের অবকাশ আছে? এটা কি কল্পনা করা যায় যে, একটা খৃষ্টান বসনিয়া যদি কোন মুসলিম সার্বিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হতো, তবে বসনিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রনিষেধাজ্ঞার মতো কোন শাস্তি প্রয়োগ করা হতো?

অথবা, চলুন আমরা উত্তর ইরাকে, বিচ্ছিন্নতাবাদী Kurdish Workers Party (PKK)-র ঘাঁটি ধ্বংস করতে, স্বল্পমেয়াদী তুর্কী অভিযানের কথা বিবেচনা করি। জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরাক তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয় এবং সে কারণেই ইরাকী ভূমি থেকে PKK-র পরিচালিত কর্মকান্ডের উপরে তার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না (অর্থাৎ ইরাকী ভূমি থেকে PKK তুরস্কে যে সমস্ত আক্রমণ চালাতো, সেগুলো ইরাক বন্ধ করতে পারেনি) আর এতেই ইরাকী ভূমিতে তুরস্কের অনুপ্রবেশ তথা সামরিক অভিযান আন্তর্জাতিক আইনে যুক্তিযুক্ত হয়ে যায় --শুধু তাই নয় তা বরং একটা "NATO সমস্যাও" হয়ে দাড়ায়। কিন্তু এই ঘটনা এমন সব মানুষ দ্বারা তীব্রভাবে সমালোচিত হয়, যারা একই ধরনের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ লেবাননে স্থায়ীভাবে অবস্থানরত ইসরাইলী সৈন্যদের সমালোচনার কথা কখনো কল্পনাই করবেন না। অবশ্য এই উদাহরণে, তুরস্ককে একটা মুসলিম দেশ হিসেবেই গণ্য করেছেন ঐ সমালোচকেরা।

www.amarboi.org

সম্ভাব্য ইসলামী রাষ্ট্রের চিন্তায়, ইউরোপীয় আতঙ্কের মূলে এরকম একটা অনুমান কাজ করে যে, ঐ ধরনের কোন রাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতার ইউরোপীয় নীতিমালার সাথে কিছুতেই সঙ্গতিপূর্ণ হবে না। এই ধরনের মূল্যায়ন আসলে সততা বিবর্জিত ; কেননা যেমনটি ১৮২৫-৩১ সালে al Tahtawi অনুধাবন করেছিলেন[৪১] সম্ভবতঃ ফ্রান্স ছাড়া, আর কোথাও সত্যিকার অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা মেনে চলা হয় না। বাকী সব পশ্চিমা দেশই খৃষ্টান-গণতন্ত্র বা খৃষ্টান-প্রজাতন্ত্র, আর তাও তা সে সব দেশের আইন/ সংবিধান অনুযায়ী।

উদাহরণ স্বরূপ, জার্মানীর সংবিধানে ঈশ্বর রয়েছেন। সেদেশে খৃষ্টান ছুটিসমূহ উদ্‌যাপিত হয়, আর রবিবার হচ্ছে সাপ্তাহিক বিশ্রাম দিবস। ঐ প্রজাতন্ত্রের চ্যান্সেলর ও প্রেসিডেন্ট বড়দিন উপলক্ষে জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। সরকারী স্কুলে, সরকারী বেতনভোগী শিক্ষক কর্তৃক খৃষ্টধর্ম শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। নব নির্বাচিত সৈনিকদের ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়ে থাকে। Catholic Lutheran ও reformed গীর্জাসমূহ, তথা ইহুদী সম্প্রদায়ের উপাসনালয়সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আয়করের পাশাপাশি "church tax" সংগ্রহ করা হয়। গীর্জাগুলো ঘন্টা বাজানোর অধিকার ভোগ করে থাকে আর "blasphemy" বা ঈশ্বর-নিন্দা "হচ্ছে একটা আইনগত অপরাধ। নির্বাচনের প্রচারণার সময় catholic bishop গণ কখনো কখনো, কাদের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিতে হবে সে ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে থাকেন।

অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ বা আমেরিকার অবস্থাও অনুরূপ। ফ্রান্সে ধর্মনিরপেক্ষতাই এক ধরনের ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। একটা মুসলিম দেশ অবশ্য ফ্রান্সের ধাঁচের ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণযোগ্য মনে করতে পারে। সেক্ষেত্রে একটা মুসলিম গণপ্রজাতন্ত্রও ধর্মনিরপেক্ষ হবে: এক্ষেত্রেও কাঠামোগত ভাবে ক্ষমতার তিনটি উৎস একে অপরের কাছ থেকে আলাদা থাকবে, অথচ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে তারা একে অপরের সহায়ক হবে। ***সুতরাং "ধর্মনিরপেক্ষ" নয় বলে একটা ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রত্যাখ্যান করাটা একটা নির্ভেজাল শঠতা।***

এধরনের দ্বৈত মাপকাঠির বা "double standard" -এর দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব অত্যন্ত দুঃখজনক। ইতিমধ্যেই অনেক তরুণ আরব ভাবতে শুরু করেছে যে, "মৌলবাদী" ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে, পশ্চিমা গণতন্ত্রী দেশগুলো সত্যি সত্যি কখনো আরব দুনিয়ায় গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটুক তা চায় না।

Menachim Begin বা Nelson Mandela এর মত এক কালের কথিত "সন্ত্রাসীরা" পরবর্তীতে উচ্চ মর্যাদায় আসীন গণতান্ত্রিক রাজনীতিবিদ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হন, যদি না ঐ সমস্ত প্রাক্তন "সন্ত্রাসী" মুসলমান হন, অথবা এমনকি Abbasi Madani র মত একজন তথাকথিত "মৌলবাদী" মুসলমান হন- এই দ্বৈত বিচারের ব্যাপারটাও উপরে আলোচিত পশ্চিমা মনোভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। তাদের মাঝে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটানোর যে সম্ভাবনা রয়েছে, সে দিকটা বিচার করেও Abbasi Madani-র মত মানুষকে সুযোগ দেয়া হয় না।

www.amarboi.org

Catholic Opus Die সংস্থা, প্রয়াত ফরাসী Archbishop Lefebre-র প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন, ইসরাইলী একত্রিকরণপন্থীগণ (Lubavitchers এবং অন্যান্যরা) ও নিউইয়র্ক এর Mair Kahane- র অনুসারীগণ, উত্তর আয়ারল্যান্ডে Catholic এবং Protestant সন্ত্রাসীগণ অথবা দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গী Catholic liberation theologists -এদের কারো নামের সাথে "fundamentalist" বা "মৌলবাদী" লেবেল এঁটে দেয়া হয় না। না, *হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যবহৃত এই "মৌলবাদী" লেবেলটি, কেবল মুসলমানদের নাজেহাল করার জন্য সংরক্ষিত।*

বসনিয়ায় হত্যাযজ্ঞ চলাকালীন সময়ে পশ্চিমা জগতের নির্বিকার এবং নিষ্ক্রিয় ভূমিকা দেখে, মুসলিম বিশ্বের অনেকেই যে অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা অধিকতর বিপদ জনক এক ইঙ্গিত বহন করে: *ইউরোপীয়রা, ইউরোপের মাটিতে একটা মুসলিম রাষ্ট্র সহ্য করার চেয়ে বরং একটি গোটা মুসলিম জনসংখ্যার বাস্তব নিশ্চিহ্নকরণ এবং নিধন মেনে নিতে প্রস্তুত।*

আমাদের বোকার স্বর্গে বসবাস করা উচিত নয়। বাস্তব সত্য হচ্ছে: ইসলামকে হেয় করতে পশ্চিমা মানসে লালিত বৈষম্যমূলক মনোভাব এতই প্রবল যে, যে কোন দিন পক্ষপাতিত্ব, ভীতি এবং নিজেদের উন্নততর মনে করার প্রবণতা থেকে একটি মুসলিম বিরোধী ধ্বংসযজ্ঞের সূচনা হতে পারে-যেমনটি ১৯৯৫ সালের ১৮ই মার্চ জার্মানীতে ঘটলো: Munich এর মসজিদ তথা ইসলামিক কেন্দ্রে মলোটোভ ককটেল ছোঁড়া হলো।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

কিভাবে ধ্বংস এড়িয়ে চলা যায় এবং ইসলামের কাজ করা যায়

এর আগের অধ্যায়গুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে, পশ্চিমা জগত এবং ইসলাম- ভূমধ্য সাগরের উত্তর এবং দক্ষিণ উপকূল- একটা ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসাত্মক সংঘাতের দিকে এগিয়ে চলেছে, যার পরিণতি উভয় অংশের জন্যই দুঃখজনক হবে- বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ইউরোপে অবস্থিত মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য তা মারাত্মক হবে। এই বিপদজনক ও বিস্ফোরক পরিস্থিতির ব্যাপারে কি করণীয়, তা নিয়ে উভয় পক্ষেই চিন্তা ভাবনা করার সময় এসেছে।

আল্‌হামদুলিল্লাহ্, পশ্চিমা জগতে এমন কিছু সচেতন ব্যক্তি রয়েছেন, যারা পরিস্থিতি যে ইতিমধ্যে কতখানি গুরুতর আকার ধারণ করেছে তা বুঝতে সক্ষম। নব্য নাৎসী যুবকগণ কর্তৃক প্রথম তুর্কী শ্রমিকদের পরিবারের উপর আক্রমণ এবং তার পরিণতিতে মৃত্যুর ঘটনার পর, এই সব সচেতন ব্যক্তিরা প্রায়শ্চিত্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ডাক দিয়েছেন। জার্মান মানুষজন, অতিথি শ্রমিক এবং তৃতীয় বিশ্ব থেকে আগত বিদ্যা-শিক্ষার্থীদের মাঝে সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এখন বেশ কিছু তৃণমূল পর্যায়ের "নাগরিক উদ্যোগ" (Burger-Initiativen) কাজ করে যাচ্ছে। অবশ্য, " তৃতীয় বিশ্ববাদ" হচ্ছে একধরনের রোমান্টিক ধ্যান-ধারণার উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট একটা মতবাদ- যার দৌড় এই ধরনের উদ্যোগ পর্যন্তই হবার কথা- কিন্তু তবু, জাতীয় ও সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ববোধের বা উগ্র জাতীয়বাদের নতুন জোয়ারের বিরুদ্ধে এটুকু চেষ্টাকেও আমাদের স্বাগত জানানো উচিত।

এছাড়া Pope এবং প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মযাজকদের নেতৃবৃন্দ, আজকাল প্রতি বৎসর, রমযানের শেষে ঈদ উপলক্ষে, মুসলমানদের শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেন না। আর মুসলমানরাও, প্রায়ই বিভিন্ন মসজিদে তাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এর প্রত্যুত্তর দেন।

১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে, Munich-এর Islamic centre যখন তার ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছিল, তখন প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের এক উচ্চপদস্থ ধর্মগুরু তাঁর ভাষণে বল্‌লেন যে, তিনি মুসলমানদের মাঝে থাকতে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন, কেননা মুসলমানদের সঙ্গে বিব্রতবোধ না করে অনায়াসে ঈশ্বর-সংক্রান্ত কথাবার্তা বলা যায়-অথচ, একটা প্রটেস্ট্যান্ট জনসমাগমে যে এ বিষয়ে আলাপ করতে গিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে না, তার কোন নিশ্চয়তাই আজ আর অবশিষ্ট নেই।

ইসলামের বিরুদ্ধে যে সমস্ত বৈষম্যমূলক পূর্ব-ধারণা পশ্চিমা জনমনে রয়েছে, সেগুলোকে ভাঙ্গার চেষ্টায় প্রচুর পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে, বিশেষতঃ কেউ যদি আজ উত্তর এবং ইসলামী দক্ষিণের মাঝে একটি শক্ত সেতুবন্ধনের স্বপ্ন দেখেন। এই প্রচেষ্টা/পরিশ্রমের

www.amarboi.org

সূচনা হতে হবে ব্যাকরণ স্কুলের পর্যায় থেকে। ইরানী অধ্যাপক Abdoljavad Falaturi (Islamic Scientific Academy, Cologne) ও তার জার্মান সহকর্মী Udo Tworuschka, এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছেন। তাঁরা Catholic ও Protestant ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তক তথা ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধীয় শত শত জার্মান পাঠ্য পুস্তকে ইসলামের উপর লিখিত অধ্যায়সমূহে যে সমস্ত "বিকৃতি" রয়েছে সে সব চিহ্নিত করেছেন[৪৩] এবং সে সবের প্রতিস্থাপনকল্পে শুদ্ধ শব্দাবলীর সুপারিশ পেশ করেছেন।[৪৪] Denmark, Finland, the Netherlands ও Italy-র মত অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের স্কুলের পাঠ্যবইসমূহের উপরও, তাঁরা একই ধরনের গবেষণা চালিয়েছেন।

Cordoba- য় Roger Garaudy কর্তৃক আয়োজিত এবং অধ্যাপক Hans Kung-এর মত ব্যক্তিত্বদের দ্বারা সমর্থিত, খৃষ্টান এবং মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের সম্মেলন, একই ধরনের উদ্দেশ্য সাধন করে। কিন্তু বিরাজমান বিশ্বজনীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, এধরনের সংলাপ বলতে গেলে অপ্রতুল ও তেমন কোন ছাপ ফেলতে অক্ষম।

বর্তমানে বিরাজমান বিস্ফোরণ-উন্মুখ পরিস্থিতিকে নিরস্ত্র করতে, মুসলমানদের অবশ্যই বিরাট পদক্ষেপ নিতে হবে। আমি এমন অনেক ক্ষেত্র চিহ্নিত করবো, যেখানে মুসলমানদের করণীয় অনেক কিছু রয়েছে। কিন্তু শুরুতেই একটা কথা আমি স্পষ্টতঃই বলে দিতে চাই - আমি ইসলামী বিশ্বাসের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের ব্যাপারে -যেমন ধরুন আল্লাহ্‌র নিজের বক্তব্য পবিত্র কোরআন বা নবী (দঃ) -এর সহীহ্ হাদীস -এর বিষয়বস্তু ইত্যাদির ব্যাপারে-কোনরূপ ছাড় দেয়ার ডাক কখনোই দেব না। ইসলামকে আধুনিকতার প্রয়োজন অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আমি ইসলামের এমন পুনরুজ্জীবন চাই যেন, আধুনিক মানুষজন এর কার্যকারিতা অনুধাবন করতে পারেন; এমনকি সবচেয়ে বীতশ্রদ্ধ পশ্চিমা মানুষটিও যেন বুঝতে পারেন ইসলাম কতখানি কার্যকর।

এই প্রচেষ্টার সৌন্দর্য্য এখানেই যে তা শান্তির জন্য নিবেদিত হয়েও একই সময়ে ইসলামকে একবিংশ শতাব্দীর এক নম্বর ধর্মে পরিণত হবার সুযোগকে সবচেয়ে সম্প্রসারিত করবে।

আমি মনে করি, মুসলিমদের দিক থেকে অন্ততঃ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে পরিবর্তন আনতে হবে-

শিক্ষা ও প্রযুক্তি
নারীমুক্তি
মানবাধিকার
রাষ্ট্র ও অর্থনীতির তত্ত্ব
যাদু ও সংস্কার ভিত্তিক কর্মকান্ড
যোগাযোগ

আর সেই সঙ্গে নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করতে হবে :

www.amarboi.org

ধর্ম হিসেবে ইসলাম এবং সভ্যতা হিসেবে ইসলামের ভিতর
সহীহ্ এবং সন্দেহজনক হাদীসের ভিতর
শরীয়াহ্ ও ফিক্হ-এর ভিতর
কোরআন এবং সুন্নাহ্র ভিতর

আমি শিক্ষা ও প্রযুক্তিকে প্রাধান্য দিচ্ছি। বহির্বিশ্বের ক্ষমতা ও সংস্কৃতির কাছে পদানত একটা অবস্থার অবসানকল্পে, এই ক্ষেত্রসমূহে যে আমাদের উম্মাহ্কে পরিবর্তন সাধন করতে হবে তা সবাই জানেন।[৪৫]

এই ক্ষেত্রসমূহে আমাদের ভবিষ্যত তৈরী হবে।

এমন একটা সময় ছিল, যখন মুসলিম দেশসমূহে শিক্ষিতের হার ছিল উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশী। কিন্তু আজ, মুসলিম দেশসমূহেই নিরক্ষরতা সবচেয়ে বেশী দেখতে পাওয়া যায়। একটা জনগোষ্ঠী বা জাতি (ধর্ম ভিত্তিক) যার পবিত্র ধর্মগ্রন্থের সূচনা হয়েছিল "পড়"! এই নির্দেশের মাধ্যমে, তাদের নিরক্ষরতার দায়ভার তারা ধর্মের উপর চাপাতে পারবে না- তাদের নিরক্ষরতা বরং একটা ধর্মনিরপেক্ষতা-উদ্ভূত কেলেঙ্কারী। তার চেয়েও খারাপ ব্যাপার হচ্ছে নিরক্ষরতার ধারণাটাই অনৈসলামিক। আমি সন্দেহ করি যে, নিরক্ষরতার সাথে ঐ মনোভাবের যোগাযোগ রয়েছে, যা Taqlid কে লালন করছিল- Taqlid এর মর্মবাণী ছিল এই যে, কোরআন এবং সুন্নাহ্ আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে, সেটুকু জানাই যথেষ্ট-যেন আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমাদের নবী, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা যেখান থেকে সম্ভব আহরণ করার তাগিদ দিয়েছেন।

ঐ ধরনের চিন্তাধারার সাথে অবশ্য সম্পূর্ণ কোরআন মুখস্থ করার মত অত্যন্ত সুন্দর ঐতিহ্যের সম্পর্ক রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে, নিষ্ঠুর অবদমন সত্ত্বেও আলবেনিয়া, কম্যুনিষ্ট চীন, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ক্যাথলিক স্পেনের মত বৈরী ভূমিতে যে ইসলাম অক্ষত অবস্থায় টিকে থেকেছে- সে জন্য এই ঐতিহ্যকে ধন্যবাদ।

কিন্তু অন্য যে কোন কিছুর মতই, মুখস্থ বিদ্যার নেতিবাচক দিকও ছিল। শুধু পবিত্র গ্রন্থের ক্ষেত্রেই নয়, বরং আজ অবধি মুসলিম দেশসমূহের শিশুদের, অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের পড়াশোনা মুখস্থ করার একটা প্রবণতা রয়েছে। এ থেকে অবশ্য একটা বিশ্লেষণ বিমুখ মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয়। বিদ্যা শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে, শিক্ষকদের উচিত তাদের কর্তৃত্বের উপর ছাত্রদের অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা। নিজেদের কর্তৃত্ব এবং পান্ডিত্যকে প্রশ্নাতীত হিসেবে পুষে না রেখে, তাদের উচিত ছাত্রদের নানা রকম প্রশ্ন ও বিশ্লেষণ করতে উৎসাহ দেয়া। ***Skepticism is the mother of all sciences বা সন্দেহবাদ হচ্ছে সকল বিজ্ঞানের উৎস।*** কোন উপস্থাপিত বিষয়ের প্রতি সমালোচনার বা বিশ্লেষণমুখী দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে, গবেষণামূলক বা প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতিই হতো না। আর সেক্ষেত্রে বিশাল আকারের doctoral থিসিস্সমূহেরও কোন মাহাত্ম্য থাকতো না- কেননা কোন স্বকীয়তা ছাড়া, ও গুলো কেবল পূর্ববর্তী প্রকাশনার অনুলিপিই হতো।[৪৬]

www.amarboi.org

জুম্মার নামাযের খুতবাহ্ দিতে গিয়ে শুক্রবার দিন খতিবেরও এই কথা মনে রাখা প্রয়োজন। আমার নিজের অনুভব হচ্ছে, ঐ সমস্ত খুতবাহ্ প্রায়ই দেখা যায় শ্রোতার আবেগের খোরাক হয়, কিন্তু তার বুদ্ধি-বৃত্তির সহায়ক হয় না। কখনো আমার এমনও মনে হয় যে ইমাম মানুষকে বুঝি একটা আসন্ন জীবন-মরণ যুদ্ধে যাবার ডাক দিচ্ছেন - ন্যায়নীতি বা ধর্মের মূলনীতির কোন বিষয়ের বিশ্লেষণের পরিবর্তে। মসজিদে বক্তাদের চিৎকার পরিহার করা উচিত, কারণ তাদের শ্রোতারা তো আর অবুঝ শিশু নন। বাক্‌চাতুর্যের অধ্যাপকগণ এবং মনোবিজ্ঞানীগণ এটা ভালো ভাবেই জানেন যে, কোন বক্তৃতার স্বর যত উঁচু হয়, তার বিশ্বাসযোগ্যতা ততই কমে যায়। পবিত্র কোরআন নিজেকে "যারা চিন্তাশীল" তাদের জন্য উপস্থাপিত করে। উলামাদেরও উচিত নিজেদের একইভাবে উপস্থাপন করা।

পশ্চিমা জগতে যেমন ধর্মযাজকগণ রয়েছেন, ইসলামী জগতের উলামারা তেমন কোন ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ নয় বলেই সাধারণতঃ বর্ণনা করা হয়। তবে আমি এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করার জন্য, ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ইসলামী জগতেও উলামারা প্রায়-গূঢ় তত্ত্ব বা জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে এক সংঘবদ্ধ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন: হাদীসসমূহের অফুরন্ত ভান্ডারই হচ্ছে মূলতঃ তাদের জ্ঞানের ভিত্তি। এটা সত্যি যে ইসলামী বিধান অনুযায়ী, ঐতিহ্যের এই বিশাল সম্ভারের উপর প্রতিটি মুসলিমের অবারিত অধিকার রয়েছে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সুন্নাহ্‌র ভিত্তিসমূহের উপর জ্ঞানলাভের সময় এবং প্রশিক্ষণ কেবল উলামাদেরই থাকে। এ থেকেই বোঝা যাবে কেন কিছু সংখ্যক উলামা, সুন্নাহ্ এবং কোরআনকে সমান মর্যাদা দিতে আগ্রহী–অথবা, কি চূড়ান্ত বিচ্যুতি!- কোন কোন ক্ষেত্রে তারা সুন্নাহকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করেন, যাতে কোরআনের আয়াতও সে সবের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। ইসলামী বিদ্যাশিক্ষার আলোকে আদব বা শিষ্টাচার সর্বদাই এক বিস্তৃত বিষয় ছিল এবং আজো আছে। পবিত্র কোরআন বুঝতে এবং ব্যাখ্যা করতে যে বিষয়সমূহের প্রয়োজন হয়- যেমন আরবী ব্যাকরণ, কবিতা ও সর্বোপরি সাহিত্য- সেগুলো এক বিশেষ সামাজিক মর্যাদা লাভ করে থাকে। এই মনোভাবের নেতিবাচক দিক হচ্ছে এই যে, এসব বিষয়ের তুলনায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ সমাজে অপেক্ষাকৃত কম সমাদৃত ও সম্মানিত হয়ে থাকে, অথচ আজকের পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জ্ঞান খুবই প্রয়োজনীয়। আব্বাসীয় এবং উমাইয়া শাসন আমলে কিন্তু এমনটা ছিল না। ঐ সময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান, অংক, রসায়ন ও উদ্ভিদ বিদ্যা ইত্যাদিতে পারদর্শী না হলে, আর তার সাথে অন্ততঃ কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞান না জানলে, কাউকে উচ্চশিক্ষিত বলে গণ্য করা হতো না। *আজ প্রক্ষালন কক্ষের পানির সরঞ্জামাদি অকেজো থাকা হচ্ছে, মুসলিম দেশে অবস্থান করার একটা অভিজ্ঞতা।*

কোন কোন মুসলিম জনগোষ্ঠীতে, এমনকি প্রযুক্তি ভীতি বা techno- phobia ও দেখতে পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে Maryam Jameelah একটা তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন- তাঁর মতে "প্রযুক্তি কোন নিরপেক্ষ বিষয় নয় (তাঁর এই কথাটা ঠিক), আর তাই একটা (মুসলিম) সমাজের আধুনিকীকরণ এবং পশ্চিমাকরণের ভিতর আসলে কোন তফাৎ নেই।

www.amarboi.org

তাদের পৃথক করা যায় না। আধুনিকতার সারমর্ম যেহেতু বস্তুবাদ, অর্থাৎ অদৃশ্যের অস্বীকৃতি - এটা বেশ আশ্চর্য্য হবার বিষয়, যখন কেউ আধুনিকতাকে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে উপস্থাপন করেন"।[৪৭]

Apple Macintosh-এর কম্পিউটারে বসে এই ইসলামপন্থী বই লিখতে লিখতে, উপরোক্ত ধারণার সাথে দ্বিমত পোষণ করার জন্য আমি দুঃখিত। Andalusia-র ইসলামীজগত ছিল এক প্রযুক্তির জগত। এই প্রযুক্তি যখন পশ্চিমাদের কাছে চলে এলো- যেমন ধরা যাক windmill এর কথা–তখন কি তার চরিত্র বদলে গিয়েছিলো? আমাদের যুক্তির সদ্ব্যবহার করবার কোরআনিক আহ্বান কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটানোর আহবানও বটে। আমি এটাও বিশ্বাস করি না যে, কোন প্রযুক্তিকে বাহ্যতঃ খৃষ্টীয়করণ বা ইসলামীকরণ করা যায়। সত্যিকার একনিষ্ঠ মুসলমান দ্বারা ব্যবহৃত হলে, প্রযুক্তি ক্ষতিকারক হবার কথা নয়।

আমরা যদি তথাকথিত পশ্চিমা প্রযুক্তিকে স্পর্শ করতে ভয় পাই, তাহলে একটা বহু মতবাদের জগতে ধর্মীয় শিক্ষার সংস্পর্শে আমাদের ছেলেমেয়েদের আসতে দেয়ার সাহসই বা আমাদের কি করে হয়? না, আমরা নির্বাসনে যেতে পারি না- আমাদের স্বেচ্ছা নির্বাসনে যাওয়া উচিতও নয়। Jamil Qureshi র সাথে আমিও একমত এবং আমিও বিশ্বাস করি যে, যেখানে মুসলিম হৃদয়ে এবং দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি রয়েছে, সেখানে ইসলামী সচেতনতা এমন এক বিমুখতা [পশ্চিমা সংস্কৃতি বিমুখতা] গঠন করতে সাহায্য করবে, যা পশ্চিমা সংস্কৃতির খুঁটিনাটি ক্ষতিকর উপাদানের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করবে। আর তাই যদি না হয়, তবে যেমনটি Broadway-র একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে বলা হয়েছে- আমাদের উচিত, "পৃথিবীটার গতি থামিয়ে, তা থেকে নেমে পড়া" অথবা হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে, সমগ্র মুসলিম জগতকে একটা প্রাকৃতিক উদ্যানে পরিণত হবার প্রক্রিয়া অবলোকন করা।

পশ্চিমা Orientalists বা প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞ কর্তৃক ইসলামী বিষয়সমূহের উপর গবেষণা এবং জ্ঞান-এমন উঁচু পর্যায়ে পৌছেছে যে, তা ইসলামী বিশ্বকে অনায়াসে লজ্জা ও সংকোচের অনুভূতি দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে Henri Haoust, Bernard Lewis, Daniel Gimaret অথবা Tilman Nagel বহু প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞের মাঝে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন। Ahmed Deedat-এর কথা বাদ দিলে, *একটা উত্তর-দক্ষিণ সংলাপের জন্য প্রয়োজনীয় সুশিক্ষিত মুসলিম "Occidentalists" বা "পশ্চিম-বিশেষজ্ঞ"রা কোথায়?*

শিক্ষা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, "জ্ঞানের ইসলামীকরণ" প্রকল্পে অবশ্য, পুনর্গঠনমূলক একটা ধারাবাহিক চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, এসব প্রচেষ্টার একাংশ বিপথগামী বলে আমার বিশ্বাস- বিশেষতঃ আদর্শভিত্তিক রং এ রঙ্গীন নয়, এমন খাঁটি বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের বেলায়ও বিজাতীয় আদর্শের ছাপ খুঁজতে গিয়ে। আমি জানি, বাস্তব জীবনে প্রায়শঃই বিজ্ঞানকে, কোন গোষ্ঠীর বক্তব্য বা আদর্শ-ভিত্তিক অনুসিদ্ধান্ত বা

www.amarboi.org

মতামতের কবলে পড়তে হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, মুসলমানদেরও এই ব্যাপারে "সমানে সমান" নীতি অবলম্বন করতে হবে। নাৎসী জার্মানীতে আমার ছেলেবেলায়, আমি এধরনের প্রচেষ্টা স্বচক্ষে দেখেছি। আদর্শবাদীরা ঐ সময়ে, "ইহুদী অংকশাস্ত্র" ও "আর্য্য অংকশাস্ত্র" এই দু'টোর পার্থক্য নির্দেশ করার চেষ্টা করেন--- কি অদ্ভুত উন্মাদনা!

আমার ধারণা, জ্ঞানের ইসলামীকরণের মাত্র একটাই (কিন্তু খুব সহজ) পন্থা রয়েছে- সত্যিকার মুসলিম বিজ্ঞানীকুল তৈরী করা।

ইসলামে মেয়েরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, অবহেলিত, অত্যাচারিত এবং মমিকৃত অবস্থায় রয়েছে– এই পশ্চিমা মূল্যায়নের মত, আর কোন কিছুই বোধ হয় ইসলামী দাওয়াতের সুযোগের পরিপন্থী নয়।

মুশকিল হচ্ছে যে, এই মূল্যায়ন তো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়- বরং দারুল ইসলামের বহু অংশেই মেয়েরা আজও তাদের কোরআন প্রদত্ত অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। *আরেক ভাবে বলতে গেলে অনেক মুসলিম মেয়েরাই এখনো জাহেলিয়াতের যুগের জীবন যাপন করছে। আর তাই ঐ জাহেলিয়াতের যুগের আগের আচরণ থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে।* হারেমের ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা যেহেতু লুপ্তপ্রায়, বহুগামিতা আজ তাই ইসলামী দাওয়াতের জন্য ততটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না, যতটা হয় আফ্রিকার নারীদের ত্বকচ্ছেদের নিষ্ঠুর রীতি (যদিও এটাকে অত্যন্ত ভুল ভাবে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়), পুরুষের উৎকৃষ্টতার ধারণা এবং প্রাচ্যের বাইরে মেয়েদের মুখ ঢেকে চলার দৃশ্য।

এই পটভূমি থেকে সৃষ্ট ধারণার বিপরীতে, বেশীর ভাগ ইউরোপীয় বা আমেরিকানকে এখনো এব্যাপারে আশ্বস্ত করতে হয় যে, ইসলামে মেয়েরা, পুরুষের মত একই ধর্মীয় মর্যাদা পেয়ে থাকে- তাদের অধিকার ও কর্তব্য একই ধরনের- তাদের একই আসন, আধ্যাত্মিকতা এবং প্রয়োজনীয় মানবিক গুণাবলী রয়েছে। ইসলামে মেয়েদের অবস্থা নিয়ে যে ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে, তার বিরোধিতা করা সম্ভব এবং তা করা একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। তা না হলে, পশ্চিমে, ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপারে কোন আশা নেই বললেই চলে।

সূরা মায়েদার ৩ নং এবং ১২৯ নং আয়াতের সমন্বিত বক্তব্য, সব সময়ের জন্য বহুগামিতাকে একটা মুসলিম কানুনে পরিণত হওয়া থেকে রোধ করার কথা ছিল- এটা বেশ সহজেই বোঝা যায়। ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী যে *পুরুষ এবং নারীকে ভিন্ন ভূমিকা (সমান মর্যাদার) পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে- যেগুলো অভিন্ন নয় কিন্তু সম্পূরক– শারীরিক এবং মানসিক দু'ভাবেই,* এই সত্যটি পশ্চিমা মানুষজনকে বোঝানো বেশ কষ্টকর এবং কোন কোন সময়ে প্রায় অসম্ভবই মনে হতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গীকে যে গোটা বিশ্ব জুড়ে নারীবাদীরা এক ঘৃণ্য ব্যাপার বলে প্রতীয়মান করার চেষ্টায় আছে, আমাদের এই বাস্তবতার সাথে সহ অবস্থান করতে হবে। আর অপেক্ষা করতে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না প্রকৃতি আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

www.amarboi.org

সূরা আল্- নিসার ৩৪ নং আয়াতের বক্তব্য সত্ত্বেও, "স্বভাবগত ভাবেই পুরুষ উন্নততর সৃষ্টি" এই সংকীর্ণ ধারণার কোন কোরআনিক ভিত্তি নেই- যদিও al rijal qawwameena ala al nisa এই প্রবাদের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পুরুষদের মর্যাদার আসন নারীদের চেয়ে উপরে এমন একটা ব্যাখ্যাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেয়া হয়েছে। মুসলিম ঐতিহ্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করে, পশ্চিমা ভাষাসমূহে কোরআনের বেশীর ভাগ অনুবাদেই এই অর্থ প্রকাশ পেয়েছে (এবং সেই সঙ্গে পৌরুষদীপ্ত মানসিকতা, যা এর জন্য দায়ী, তাও প্রকাশ পেয়েছে)। এভাবে M.Savary[৪৮], Lazarus Goldschmidt[৪৯], Max Henning[৫০], Pesle and Tijani[৫১] এবং Rudi Paret[৫২] এদের সবার বর্ণনায়, পুরুষরা নারীদের চেয়ে "উন্নততর" অথবা তাদের "উচ্চতর আসন" দেয়া হয়েছে এমন বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। Muhammad Hamidullah[৫৩] পুরুষদের, মেয়েদের "পরিচালক" হিসেবে মূল্যায়ন করেন ; Hamza Boubakeur[৫৪], Denise Masson[৫৫] এবং কোরআনের অনুবাদ সংক্রান্ত সৌদি কমিটি[৫৬] -এদের সবার ব্যাখ্যায় "মেয়েদের উপর পুরুষদের কর্তৃত্ব রয়েছে" এমন ভাষা দেখতে পাওয়া যায়। Sadok Mazigh[৫৭] পুরুষদের, নারীদের উপর "তদারকি" করার অধিকার দেন। উপরে বর্ণিত সব অনুবাদই মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত জীবনধারার প্রতিফলন। তথাকথিত Dar al Islam এর অনেক অংশেই, মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই- অর্থাৎ মেয়েরা- নিয়মতান্ত্রিকভাবে, সম্পূর্ণ কর্মদক্ষ বা শিক্ষিত মানুষ হিসেবে পূর্ণতা লাভ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন।

কিন্তু surat al Nisa র ৩৪ নং আয়াতকে কেবল এভাবেই বুঝতে হবে এমন কোন কথা নেই। ঐ একই আয়াতের এধরনের অর্থও বোঝা যায় যে "পুরুষরা মেয়েদের পূর্ণ দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে" (Muhammad Asad) [৫৮] অথবা "পুরুষরা মেয়েদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবে" (T.B.Irving [৫৯]) অথবা এরকম যে, "পুরুষেরা হচ্ছে নারীদের রক্ষাকর্তা ও ভরণপোষণের দায়িত্ব সম্পন্ন" (A Yusuf Ali 60)। Jacques Berque (Les hommes assumes les femmes) [৬১] এবং Adel Khoury[৬২] উভয়েই এধরনের ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।

জার্মান ভাষা মনে হয় qawwamuna শব্দটির সত্যিকার অর্থ প্রকাশে সক্ষম- যদি কেউ এ শব্দের অনুবাদে vorstehen[৬৩] না লিখে einstehen লিখেন। উভয় অনুবাদেই অবশ্য পুরুষরা নারীদের সামনে পথ চলে- তবে শব্দটা vorstehen হলে সেই এগিয়ে থাকা হচ্ছে কর্তৃত্বের অনুশীলনকল্পে, আর যদি তা einstehen হয় তবে তা হবে নারীর সংরক্ষণকল্পে। অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে- *পুরুষদের নারীদের রক্ষণাবেক্ষণ বা নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে বলা হচ্ছে, যদি/ যতক্ষণ তাদের তা প্রয়োজন হয় এবং যতক্ষণ তারা তা চান।*

www.amarboi.org

আমার কাছে মনে হয় যে, কোরআনের এই নির্দিষ্ট আয়াত যে ভূমিকা পালন করেছে, তা *বিরাজমান প্রাক-ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে কোরআনকে খাপ খাইয়ে নেয়ার একটা উদাহরণ।*

হিজাবের প্রসঙ্গেও অবস্থাটা খুব একটা ভিন্নতর নয়। এই সত্যটা প্রায়ই চোখে পড়ে না যে, এই অনুশাসনটা, সঙ্গত কারণেই, কেবল মাত্র বিশ্বাসীদের মায়েদের বেলায় প্রযোজ্য [উম্মুল মু'মিনীনদের অর্থাৎ রসূল (দঃ) এর স্ত্রীদের বেলায়-কোরআন ৩৩ঃ৫৩]। অন্য সব নারীদের অবশ্য তাদের বাইরের পরিচ্ছদকে (চাদর বা ওড়না) বুকের উপর ছড়িয়ে দিতে বলা হয়েছে, যাতে তাদের সম্ভ্রান্ত মহিলা বলে বোঝা যায় এবং তারা যেন যৌন আবেদন সৃষ্টি না করেন [কোরআন ৩৩ঃ৫৯]। এর সাথে অবশ্য কোরআনের ২৪ঃ১ আয়াতটি পড়া উচিত, যেখানে বলা হচ্ছে যে, তারা যেন তাদের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন না করেন এবং দেহের সেই সব অংশ ব্যতীত বাকিটুকু ঢেকে রাখেন, যে সব অংশ স্বাভাবিক ভাবে দেখা যায় (illa ma zahara minha).

ঐতিহ্যগত ভাবে এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শুধু মাত্র একজন নারীর মুখ, কব্জির নীচের হাতের অংশ এবং পায়ের পাতা দেখা যেতে পারে–এ এরকমই বলা হয়- এবং ক্ষেত্র বিশেষে এর চেয়েও কম অনুমোদন করা হয়- যেমন আলজেরিয়ার দক্ষিণ অংশে (M'zab) এবং সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত সৌদি শহরগুলোতে, মেয়েরা সম্পূর্ণ মুখ ঢেকে চলে।Muhammad Asad এর মতে illa ma zahara minha কে একটা জ্ঞান সম্পন্ন শর্ত হিসেবে বোঝা যেতে পারে, যা "মানুষের নৈতিক ও সামাজিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় যুগোপযোগী পরিবর্তনসমূহকে অনুমোদন করে[৬৪]।" তিনি সেই সঙ্গে এও ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, যা সব সময়েই সবার বোঝা উচিত ছিল: Khimar দ্বারা বক্ষদেশ ঢেকে চলার যে অনুশাসন রয়েছে, তা দিয়ে Khimar-এর ব্যবহারকে অবশ্য করণীয় বলা হয়েছে এমন কোন কথা নেই, বরং একথাটাই পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে একজন নারীর বক্ষদেশ 'যা স্বাভাবিকভাবে দেখা যায়' তার আওতায় পড়ে না, আর তাই তা প্রদর্শন করা যাবে না"।[৬৫]

উষ্ণ অঞ্চলের দেশগুলোতে, যেখানে মেয়েরা খর-তাপ, বায়ু ও ধূলো থেকে নিজেদের রক্ষা করতে, সব সময়েই তাদের চুল ঢেকে চলেছেন, সেখানকার মুসলিম ঐতিহ্যের সাথে Asad বা অন্যান্যরা যা বলছেন, তা সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে। এ ব্যাপারটা বিতর্কের উর্ধ্বে। সে যাই হোক প্রশ্ন হচ্ছে, এই ধরনের কোন ঐতিহ্য–তা যদি Umar Ibn al Khattab এর সময়ও প্রবর্তিত হয়ে থাকে-তা কি মেয়েদের এমন কোন স্বাধীনতা হরণ করতে পারে যা নীতিগত ভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত?

আজকের দিনে উত্তরাঞ্চলের সব দেশসমূহে মেয়েদের চুল দেখানোকে যৌন আবেদনের পর্যায়ে দেখা হয় না। কেবল মাত্র মাথায় একটা স্কার্ফ না পরার জন্য কোন মেয়েকে বেশ্যা বা সস্তা সাব্যস্ত করা হয় না। এরকম এক সভ্যতায়, মুসলিম মেয়েদের ও

www.amarboi.org

মাথা ঢেকে স্কার্ফ পরার ব্যাপারটা নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন নেই। এটা, মুসলিম নারীরা যে মুসলিম নারী, তা প্রতীয়মান করার কাজে লাগে (আর তা হয়তো অন্যভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে)।

যে কোন মুসলিম নারীরই তাই, সে যে পরিবেশে বড় হয়েছে, আর সে এখন যে পরিবেশে বসবাস করছে, এই দু'টো বিষয়ের বিবেচনায় তার জন্য কি যথাযথ - সে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার থাকা উচিত। সে যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুক না কেন, তার পক্ষে ভালো ইসলামী যুক্তি থাকতেও পারে। তাই সে ঢেকে চলছে কিনা তার উপর ভিত্তি করে- অথবা তার চেয়েও খারাপ ব্যাপার- তার উপর মুখ ঢেকে চলার নিয়ম চাপিয়ে দিয়ে, যেন তার ধর্মপরায়ণতার বিচার না করা হয়। La ikrah fi al din (ধর্মের ব্যাপারে কোন জোরাজুরি নাই) এ আদেশ সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই।

আমি ভালোই বুঝতে পারছি, কোন মুসলিম আইনের বিশেষজ্ঞরা এযাবত, মানবাধিকারের বিষয়ে কেন সংলাপ এড়িয়ে গেছেন- যেন বিষয়টি আপনা আপনিই কখনো অদৃশ্য হয়ে যাবে এই আশায় অথচ বাস্তবে বরং তার উল্টোটাই হচ্ছে, যত দিন যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানবাধিকারের বিষয়টির গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। এটা ঠিক যে, "মানবাধিকার" এর বিষয়টি কোরআন বা ইসলামী আইন শাস্ত্রে দেখা যায় না। উচ্চতর বা নিম্নতর মর্যাদার কথা ভেবে ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী রচিত হয়নি। স্বাভাবিকতার মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে গঠিত আইনের নীতিমালার মাধ্যমে অবশ্য শরীয়াহ্ শিক্ষা দেয়া যায় না।

এর ফলশ্রুতিতে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, মানবাধিকার সনদসমূহকে আজ মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[৬৬] যদিও "মানবাধিকার সম্পর্কিত কথাবার্তা হচ্ছে, আসলে ক্ষমতার কথাবার্তা"।[৬৭] মানবাধিকার সংক্রান্ত বিতর্কে অনুপস্থিত থাকার ব্যাপারটা, মুসলিমদের বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে-কেননা, এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কোনটা নৈতিক আর কোনটা নৈতিকতা বিরোধী, সেটাও আমরা অন্যদের নির্ধারণ করতে দিচ্ছি। মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের মাঝে সৃজনশীল চিন্তাভাবনার অভাব যে ইসলামের কি সাংঘাতিক ক্ষতি করতে পারে, এটা তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ।

"মানবাধিকার" নামের একটা বিশেষ প্রতিকৃতি যদিও বাইবেল বা কোরআনে দেখতে পাওয়া যায় না, তবু এটা প্রমাণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল যে, *এ বিষয়ে পশ্চিমের কোন প্রচেষ্টার এক হাজার বৎসর পূর্বেই, কোরআন সব মৌলিক ও আদর্শ মানবাধিকার সংরক্ষণ করেছিল।* তবে সে অধিকার ব্যক্তিবিশেষের তথাকথিত "জন্মগত অধিকার" ছিল না বরং আল্লাহ্‌র আদেশের মাধ্যমে শরীর ও জীবন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, অন্তরঙ্গতা ও আত্মসম্মান, ব্যক্তিসম্পত্তি ইত্যাদি সব কিছুকে সম্মান ও সংরক্ষণ করার তথা মানুষের কল্যাণ বিধান করার যে তাগিদ দেয়া হয়েছে, তাতেই মানবাধিকার সংরক্ষণের অনুশাসন প্রতিফলিত হয়।[৬৮]

www.amarboi.org

এটা সত্যি যে, প্রকৃতিগত ভাবে লব্ধ অধিকার বা জনমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন অধিকারের ধারণা ইসলামে নেই। মুসলমানদের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষিত হবে, শরীয়ায় নির্ধারিত কর্তব্যসমূহের সঠিক প্রয়োগ ও পালনের ফলে। কিন্তু আন্তঃসংস্কৃতি সংলাপের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে বাস্তব ফলাফল- ফলাফলের পেছনের তত্ত্ব নয়। *সুতরাং ইসলামকে একটা ব্যাপক মানবাধিকার ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে, যা পশ্চিমা ব্যবস্থার সম্পূরক হবে।*

কিন্তু আমাদের আকাঙ্খিত এ ধরনের ঘটনা খুব কমই ঘটেছে এবং হয়তো সময় পেরিয়ে যাবার পরে ঘটেছে।[৬৯] পৃথিবী তাই বিশ্বাস করে যে, ব্যক্তির আবশ্যিক অধিকার সমূহ সংরক্ষিত হচ্ছে English Magna Charta libertatun (1215), Habeas Corpus act (1679) এবং Bill of Rights (1689) ইত্যাদির ফলশ্রুতিতে। American Declaration of Independence (1776) এবং French Declaration des Droits de l'homme et du citoyen (1784) উভয় সনদের বেলায়, মানবাধিকার বিষয়সমূহের ফর্মূলা তৈরী করতে, উপরে উল্লেখিত আইনসমূহের বিশাল অবদান রয়েছে।

এই সব নথিপত্র, জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ (1948) এবং ১৯৬৬ সালের দু'টি আন্তর্জাতিক চুক্তির ফলে, আজ মানবাধিকারের তত্ত্বীয় সংরক্ষণের সমস্ত কৃতিত্ব পাশ্চাত্যকেই দেয়া হয়। (আমরা সবাই যেমনটি জানি–বাস্তবে–স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সত্যিকার নীতিমালার উপর, উল্লেখিত নথিসমূহের প্রভাব খুব সামান্যই।)

নতুন নতুন "মানবাধিকার" আবিষ্কারের যে ঢং চলছে, মুসলিমদের সে সব থেকে সাবধানতার সাথে দূরে থাকা উচিত; "ভয় পাবার অধিকার" বা "চরমপুলকের অধিকার (যেমন ড্রাগ সেবন ইত্যাদি থেকে)" এগুলো হচ্ছে সমকালীন নতুন নতুন আবিষ্কৃত "মানবাধিকারের" উদাহরণ। অবশ্য, মুসলিম আইনের বিশেষজ্ঞদের উচিত, তাদের পাঠ্যবই সমূহে অন্তত মানবাধিকার সংক্রান্ত অধ্যায় সংযোজন করা। আমরা ন্যূনতম যা করতে পারি, তা হচ্ছে পার্লামেন্টসমূহে বিস্তারিত আইনের মাপকাঠির চেয়ে, নীতিগত ভাবে, আল্লাহর নির্দেশিত আচরণবিধি যে মানুষকে বেশী নিরাপত্তা দিয়ে থাকে-এই সত্যটা তুলে ধরতে পারি। কোরআনের কোন আদেশ আইন প্রণয়নকারীদের দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে না, এমনকি গণভোটের মাধ্যমেও তা বাদ দেয়া যাবে না।

সুখের বিষয়: পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, মানবাধিকারের উপর বিভিন্ন মুসলিম ঘোষণাবলী, কেবল দু'টো ছাড়া প্রায় সকল মানবাধিকার সমস্যার সমাধান ব্যাখ্যা করে এটা প্রমাণ করার মত একটা সুবিধাজনক অবস্থান আমাদের রয়েছে।

যে দু'টো বিষয় নিয়ে সমস্যা হবে সেগুলো হচ্ছে: প্রথমতঃ, উত্তরাধিকার ও বিবাহের নিয়মাবলীর বেলায়, শরীয়াহ্, মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। এই পার্থক্যের মূলে রয়েছে ইসলামিক উম্মাহ্ বা "মুসলিম জাতির" ধারণা- একজন মুসলিমকে

www.amarboi.org

তার ধর্ম, মুসলিম উম্মাহ্‌র সদস্যপদ দিয়ে এক ধরনের নাগরিকত্ব প্রদান করে। সেজন্যই, পশ্চিমে যেমন কেউ তার জাতীয়তা পরিত্যাগ করলে তার বেলায় প্রযোজ্য আইনসমূহ বদলে যায় [যেমন ধরুন, তাকে হয়তো Passport ফেরত দিতে হয়]-তেমনি, কোন মুসলিম যখন তার ধর্ম পরিত্যাগ করে, তার বেলায়ও নিয়ম কানুন ভিন্ন হয়ে যায়। কোন ধর্মের অবলম্বী হবার জন্য লব্ধ অধিকার বা লুপ্ত অধিকার এর ব্যাপারটা, অবশ্য পশ্চিমী চিন্তাধারা প্রত্যাখ্যান করে থাকে। দ্বিতীয়তঃ পরিবারের প্রতি দায়-দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, নারী ও পুরুষের ভূমিকার তেমন কোন তফাৎ নেই- এ পশ্চিমা কল্পকাহিনীর সম্পূর্ণ অনুগত হওয়াটা, মুসলিম আইনের পক্ষে সম্ভব নয়। একই ভাবে, মুসলিম আইন সমকামিতাকেও বহাল করতে পারে না।

প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের দৃষ্টিভঙ্গীর, এই শেষোক্ত পার্থক্যই হচ্ছে একটা আপাতঃ সাংস্কৃতিক সংঘাতের ইঙ্গিত। প্রাচ্য বিশ্বাস করে যে একজন নারী যদি একজন পুরুষের অনুকরণ করতে চায়, তবে সে তার একান্ত নিজস্ব প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। পশ্চিমে, নারীবাদীরা এখনও বিশ্বাস করে যে, একজন নারী যতক্ষণ না প্রতিটি ক্ষেত্রেই একজন পুরুষের অনুকরণ করতে সক্ষম, ততক্ষণ সে মুক্তি লাভ করেনি। আমি "এখনও" কথাটা এজন্য বলছি যে, কিছু সংখ্যক সর্বাধিক "মুক্তিপ্রাপ্ত" আমেরিকান মহিলা, একটা নিষ্ফল Career বা পেশার জন্য নিজেদের পরিবার, এমনকি মাতৃত্বকে ত্যাগ করা আদর্শের প্রতি সম্প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন।

মুসলিম দেশসমূহের জন্য, একটা কৌশলগত দিক নিয়ে বিতর্কের অবকাশ সৃষ্টি হচ্ছে: যে সমস্ত মুসলিম দেশ পশ্চিমা মানবাধিকার সনদ এখনও স্বাক্ষর করেনি, তারা কি উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে তা স্বাক্ষর করবে? নাকি তারা তাদের নিজস্ব "মানবাধিকার সংক্রান্ত ইসলামী ঘোষণা" নিয়ে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আক্রমণাত্মক ভাবে সামনে এগিয়ে যাবে?

এই বিতর্কের ফলাফল যাই হোক না কেন, আমাদের উচিত, আসামীসুলভ ভঙ্গীতে এবং ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে কথা না বলা -তা না হলে মনে হবে, এক্ষেত্রে বুঝিবা ইসলামের লুকানোর কিছু রয়েছে।

রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ব্যাপারেও মুসলিমদের অবস্থান সমান হতাশাব্যঞ্জক। প্রায়ই ভুল বোঝা হয়ে থাকলেও একথাটা সত্যি যে, বিংশ শতাব্দীর শেষে এসেও, মুসলিমরা এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এখনও হিমসিম খান যে, একটা সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্রের চেহারা কেমন হবে ?[৭০] অথচ ৬২২[৭১] খৃষ্টাব্দেই মুহাম্মদ (দঃ) মদীনায় একটা মৈত্রীবদ্ধ রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিলেন। Albert Hourani র মত কেউ কেউ মনে করেন যে, ইসলাম যেহেতু ইতিহাসের পূর্ণ আলোকে জন্মগ্রহণ করেছিল, সেহেতু একটা ইসলামী রাষ্ট্রকে সংজ্ঞায়িত করা অসুবিধাজনক।

অনেকে আবার মনে করেন যে মুসলমানরা রাষ্ট্রসত্তার ধারণাটাতেই এখনো ঠিক অভ্যস্ত হতে পারছেন না, কেন না ইসলামিক উম্মাহর আদর্শের কথা ভাবলে, জাতীয়

www.amarboi.org

রাষ্ট্রসমূহ, ইসলামিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না।[৭২] যেমনটি Vatikiotis বলেছেন "একটা দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ" [৭৩] এই শেষোক্ত শ্রেণীর চিন্তাবিদদের মতে "সৃষ্টি সংক্রান্ত দর্শন যখন বিফল হয়, তখন মানুষ রাজনীতি করতে শুরু করে"।[৭৪]

মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্টদের মত, মুসলিমদের অতি অবশ্যই এই আশা ও লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করে যেতে হবে যে, ভবিষ্যতে জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ লুপ্ত হয়ে একটা অভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে।

আমার মতে, বিরাজমান অবস্থার পেছনের সত্যিকার কারণ হচ্ছে বিরাট মাত্রার নমনীয়তা-কোরআন ও সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাঁর অশেষ দয়া প্রদর্শন করেছেন। একটা সরকারের চেহারা কেমন হতে হবে, সে সম্বন্ধে খুবই অল্পসংখ্যক কোরআনিক আদেশ রয়েছে এবং সুন্নাহও এব্যাপারে কোন স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয় না। এই নমনীয়তা একটা আশীর্বাদ ছিল, কারণ তা মুসলিম উম্মাহ্‌কে আইনগত ও সামাজিক বিষয়সমূহের কঠোরতা থেকে রক্ষা করে। এটা সবযুগের জন্যই প্রযোজ্য যে, কোরআন ও সুন্নাহ্ কোন বিশেষ কাঠামোর রাষ্ট্র বা নির্বাচনের পদ্ধতি ইত্যাদি বেঁধে দেয়নি। তারা [কোরআন ও সুন্নাহ্] রাজতন্ত্র বা উদার ধর্মভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা যেমন অনুমোদন করে, তেমনি অনুমোদন করে গণতন্ত্র- যেমনটি কোন বিশেষ পরিস্থিতির বা অবস্থার দাবী। প্রতিটি প্রজন্মের প্রতিই আহ্বান থাকে, তাদের নিজের চাহিদা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি ঠিক করে নিতে।

মানবাধিকার নিয়ে কথা বলতে গেলে যেমন হয়, তেমনি এক্ষেত্রেও মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ শব্দচয়ন সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হনঃ " ক্ষমতার পৃথকীকরণ" , "সংসদীয় গণতন্ত্র", "সাধারণ নির্বাচন" "প্রজাতন্ত্র", " ক্ষমতার ভারসাম্য", "বিপ্লব", " দলীয় পদ্ধতি", " সার্বভৌমত্ব", এসবের মত আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের "মোক্ষম শব্দাবলী" কোরআন, সুন্নাহ্ বা ঐতিহ্যবাহী ইসলামী আইনে ব্যবহৃত হয়নি।

এর অর্থ এই নয় যে, কেউ এমন ঢালাও মন্তব্য করে বসবেন যে Ibn Taymiyah -র পরের ইসলামী মতবাদসমূহের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় কিছুই নেই।

এ ব্যাপারটা অনেকেরই দৃষ্টি গোচর হয় না যে কোরআন কেবল Surat Al Imran এর ১৫৯ নং আয়াতে মতামত ও পরামর্শের মাধ্যমে সরকার[৭৫] গঠনের আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং Surat al Shura এর ৩৭-৩৯নং আয়াতে এটা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, *পরামর্শের নিয়ম হচ্ছে একটা অন্যতম ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা।* অবশ্যই, এ ব্যাপারটাকে, বিশ্বাসের "স্তম্ভ সমূহ", যেমন নামায, যাকাত, সামরিক নিরাপত্তা, দানশীলতা ইত্যাদির পাশাপাশি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

এভাবে, একটা নির্বাহী সরকার প্রতিষ্ঠার চেয়ে, পরামর্শের মাধ্যমে সরকারী কর্মকান্ড পরিচালনার নীতিকে কোরআনে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে (২ঃ৩০, ৪ঃ৫৯)। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্ এ ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, *গোটা মুসলিম*

www.amarboi.org

জনগোষ্ঠীকেই, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলীফা হিসেবে কর্তব্য পালন করতে হবে। ২ঃ৩০ এ কোরআন যখন পৃথিবীর উত্তরাধিকারের কথা বলে, তখন কেবল সরকার প্রধানের কথাই বলে না বরং সকল মানুষের কথাই বলে।

উপরন্তু ৬ঃ ১৫৬, ২৭ঃ ৬২ এবং ৩৫ঃ৩৯ আয়াতসমূহে সমগ্র মানবকুলকেই-পৃথিবীর খলিফা বলে ভাবা হয়েছে। কোরআনের ২৪ঃ৫৫ আয়াত থেকে একই অনুসিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। একটা মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলতে গিয়ে যখন বলা হয় যে, সেটা হবে মানুষের ইতিহাসের সর্বোত্তম সম্প্রদায় বা সমষ্টি, যারা সৎ কাজের আদেশ করবে আর মন্দ কাজে নিষেধ করবে (৩ঃ১১০), তখন সব নাগরিকের কথাই বলা হয়- যদি তারা একনিষ্ঠ বিশ্বাসী হয়।

উম্মার এই বিশেষ মর্যাদা আর Shura বা পরামর্শের মৌলিক দায়িত্বের ধারণা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, *পরামর্শের ব্যাপারটা নিছক একটা উপদেশ মূলক কর্মকান্ড নয় বরং তার ধরনটা হচ্ছে বাধ্যতামূলক।* এর উপর ভিত্তি করে এবং কোরআনের ৭ঃ১৫৫ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে সন্দেহের আর কোন অবকাশ থাকে না যে, *একটা প্রতিনিধিত্বমূলক প্রজাতন্ত্রের আঙ্গিকে, গণতন্ত্র, ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।* একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বিশেষে, এধরনের একটা প্রজাতন্ত্রই সবচেয়ে উপযুক্ত বা ভালো ধরনের রাষ্ট্রীয় কাঠামো কিনা, তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে সাধারণ উন্নয়নের মানের উপর। পশ্চিমে একটা নতুন মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভবকে, কেবল একটা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কাঠামোতেই কল্পনা করা যায়।

এমনকি Parvez Mansoor যদিও বলেন যে ইসলামে "কোন গীর্জা, দল বা ধর্মযাজক নেই"[৭৬], একটি মুসলিম গণতন্ত্রকে অবশ্যই একটা বিরোধী পক্ষ (দল) বরদাস্ত করতে হবে, যাতে কোন একটা ইস্যুর ব্যাপারে বিরোধিতা করার সুযোগ থাকে-এ ধারণাটা ততক্ষণই কার্যকর হবে যতক্ষণ ঐ বিরোধী পক্ষও একটা অভিন্ন লক্ষ্যের প্রতি আস্থাশীল [যেমন মুসলিম উম্মাহ্‌র একতা ও উন্নয়ন] এবং তারা ভোটের ফলাফল মেনে নিতে প্রস্তুত। *"ইজতিহাদের বিষয়সমূহে, মুসলিম জনগোষ্ঠীর জ্ঞানীজনদের মধ্যে মতপার্থক্য হচ্ছে ইসলামিক শরীয়ার সুযোগ-সুবিধার অংশ বিশেষ"*-এ হচ্ছে একটা হাদীসের মর্মার্থ।

কোরআনের ৬ঃ১১৬ নং আয়াত আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল হবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। আর তাই, ধর্মীয় মতবাদের বিষয় সমূহে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যাপার গ্রাহ্য করার প্রয়োজন নেই। পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহের শাসনতন্ত্রও তেমনি সব ইস্যুকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয় না-যেমন ধরুন মানবাধিকারের ব্যাপারটা।

একটা মুসলিম সংসদীয় গণতন্ত্র তাই না ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের শাসন হবে, না ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা হবে। বরং তা হবে কোরআনকে চূড়ান্ত আইন মনে করে প্রতিষ্ঠিত একটা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। সেটাও তেমন সবিশেষ কিছু নয়। আমি এমন কোন রাষ্ট্রের কথা জানি না, যেটা কোন আদর্শের উপর নির্ভর না করেই তার কর্মকান্ড সমাধা করে থাকে।

www.amarboi.org

সে আদর্শ সরকারী ভাবে স্বীকৃতই হোক, আর সুপ্তই হোক, এমনকি নিদেনপক্ষে, প্রতারণামূলক, আদর্শবিহীনতার আদর্শতো তাদের রয়েছেই। যাহোক, প্রায় প্রতিটি অমুসলিম রাষ্ট্রই কোন না কোন বিশেষ মূর্তিকে সম্মান জানিয়ে থাকে–যে সবের প্রতি সম্মানবোধ, আংশিকভাবে হলেও, সম্ভাব্য পুনর্মূল্যায়নের আওতার বাইরে।

রাষ্ট্রের কাঠামো যেমনই হোক না কেন, একটা সুবিচারক সরকারের ব্যাপারে কোরআনের গুরুত্ব আরোপের প্রবণতা এবং প্রবলতা থেকে এই উপসংহারে পৌছানো যায় যে, ইসলাম এক স্বনির্ভর বিচার ব্যবস্থা (aqdiyah) দাবী করে (4: 58, 5:8, 57:15)[৭৭]। মানুষের স্বভাব বিচার করলে, এর চেয়ে ভালো কোন বিচারের নিশ্চয়তা, কোন কর্তৃপক্ষ আর কিভাবেই বা দিতে পারে?

সারকথা হচ্ছে, গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র বা ক্ষমতার পৃথকীকরণ প্রশ্নে যখন কেউ চ্যালেঞ্জ করবে তখন মুসলমানদের খাটের তলায় গিয়ে লুকানোর চেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত। বরং তাদের উচিত চ্যালেঞ্জকারীদের নিশ্চিতভাবে একথা বুঝিয়ে দেয়া যে, ঐ সমস্ত ধারণা, স্বভাবগতভাবে, ইসলামের কাছে নতুন কিছু নয় বা ইসলামের সাথে ঐ সমস্ত ধারণার কোন স্বভাবগত বৈরীতাও নেই।

মুসলিম অর্থনীতিবিদদের বৈজ্ঞানিক অবদানের অভাব না থাকলেও, মুসলিম রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের অবদান পর্যাপ্ত নয়।[৭৮] আমি মনে করি অনেক মুসলিম দেশেই, সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলাটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ একটা ব্যাপার। অথচ অর্থনীতি নিয়ে কথা বল্‌লে, সে সবকে বেশ কল্পনা-প্রসূত ব্যাপার ধরে নিয়ে, সহজভাবে বরদাস্ত করা হয়।

ইসলামী অর্থনৈতিক বিজ্ঞানকে কেন Utopian বা কাল্পনিক হতে হবে? এক্ষেত্রেও "দোষ"টা গিয়ে পড়বে কোরআনে তেমন কোন শক্ত বিধি-নিষেধের অনুপস্থিতি থেকে উদ্ভূত এবং বিজ্ঞভাবে প্রদত্ত নমনীয়তার উপর (riba বা সুদের ব্যতিক্রম ব্যতীত)। সুদ সংক্রান্ত কোরআনিক আয়াতসমূহ অবশ্য, এই ইস্যুকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব সহকারে প্রচারে সাহায্য করেছে। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, পেট্রো-ডলারের বিশাল সুদ উপার্জনকারী ব্যাঙ্ক একাউন্টসমূহ সংরক্ষণের নীতির পরিপ্রেক্ষিতে, সুদের বিরুদ্ধে কোরআনিক অনুশাসন, মুসলমানদের একদল মুনাফিক হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

আমাদের সোজাসাপটা ভাবে স্বীকার করা উচিত যে, *একটা ইসলামী অর্থনীতি কখনোই পশ্চিমা অর্থনীতির মত দক্ষ ও লাভজনক হতে পারে না, তা হওয়া উচিতও নয় এবং সেটা তা হবে না*–কেননা পশ্চিমা অর্থনীতি মানুষকে অর্থনৈতিক পশু হিসেবে গণ্য করে থাকে। আমরা যদি পশ্চিমা অর্থনৈতিক পদ্ধতির অনুকরণ করতে চাই, তবে আমাদের জীবনের প্রতিটি দিককেই, আমাদের, শিল্প উৎপাদনের প্রয়োজনীয় দাবীর কাছে উৎসর্গ করতে হবে। যেমনটা পশ্চিমে হয়ে থাকে, আমাদের জীবনের সব দিকই তখন অর্থনীতির নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে- আর, আমরা সবাই তখন সর্বোচ্চ মুনাফা, নির্ধারিত উৎপাদন এবং ব্যয়-সংকোচন ইত্যাদি নিশ্চিত করতে সংগ্রাম করে যাবো।

www.amarboi.org

এই প্রক্রিয়ায়, ইসলামী বিশ্ব, পশ্চিমা সমাজের মতই এক বস্তুবাদী সমাজে পরিণত হবে, আর সেই সাথে তা তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক দিকটিও হারাবে: অর্থনীতি অথবা প্রযুক্তির পরিবর্তে, আল্লাহ্ ও মানুষকেন্দ্রিক ভাবনা চিন্তা থেকে উদ্ভূত, প্রাচ্যের জীবন ধারার উন্নত মান। পরকালে অবিশ্বাসী একটা সমাজ এবং আল্লাহ্ তথা পরকালে আস্থাশীল একটা সমাজের মধ্যে এটাই প্রধান পার্থক্য। সুতরাং Syed Nawab Haider Naqvi যখন বলেন যে, "ইসলাম পুঁজিবাদী মনোবৃত্তি প্রত্যাখ্যান করে"[৭৯] তখন তাকে সঠিকই বলতে হবে।

আর তাই চলুন, আমরা তাদের সোজাসুজিই বলে দিই: *মুসলমানরা পশ্চিমা ধাঁচের অর্থনীতি অবলম্বন করতে চায় না।*

তাছাড়া Riba বা সুদ সংক্রান্ত আলাপ আলোচনাকে প্রায়ই খাটো করে দেখা হয়েছে। পুঁজির উপর সুদ পশ্চিমা অর্থনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকান্ড সমাধা করে থাকে। যেমন, পুঁজির বিশাল সঞ্চয় ও দক্ষ বন্টন, দক্ষতা নিয়ন্ত্রণ, বিশ্লেষণ-ধর্মী আর্থিক নীতিমালা এবং মুদ্রা বিনিময়হার সংরক্ষণ ইত্যাদি।

পুঁজির উপর সুদের ব্যাপারটার এই বিশেষ গুরুত্ব থেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সুদের অবসান কোন দৈব ব্যাপার নয়- যা অতি সহজেই গতানুগতিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে একেবারে রাতারাতি বদলে দিতে পারে। শুধু সুদের অবসান ঘটিয়ে পুঁজির "ইসলামীকরণ" সম্ভব নয়।।[৮০] পক্ষান্তরে, সুদের অবসান প্রকল্প কেবল ঐ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই পুরোপুরি কার্যকর হবে, যা ইতিমধ্যেই ইসলামী এবং সেজন্য নিবেদিত প্রাণ মুসলমানদের কাজেকর্মেও সত্যিকার মুসলমান হিসেবে আচরণ করাটা অপরিহার্য্য।

Ayat al Riba বা সুদ সংক্রান্ত কোরআনের আয়াত এর অর্থ, বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কি দাঁড়াবে, সে ব্যাপারে সত্যিকার ইজতিহাদের অবকাশ থাকতে হবে। নবী (দঃ)র সময় আরব ভূমিতে সুদের হার ছিল অত্যন্ত চড়া। আর তাছাড়া, সবচেয়ে দরিদ্র শ্রেণীর টিকে থাকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, বাকীতে ভোগ্যপণ্য বিক্রীর প্রথা প্রচলিত ছিল -একটা প্রক্রিয়া, যা প্রকারান্তরে শোষণের জন্ম দিত। প্রযুক্তিগত মজুদ খুব একটা না থাকায় এবং স্থিতিশীল মুদ্রা বা "Hard currency" ব্যবহৃত হওয়াতে, তখন একদিকে যেমন বিশাল পুঁজি সংগ্রহের কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, অপর দিকে তেমনি মুদ্রাস্ফীতি জনিত ক্ষতির কথা জেনে, ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণেরও কোন প্রয়োজন ছিল না।[৮১]

আজ এ বিষয়ে কোন বিশ্লেষণ করতে বসলে, তা অন্ততঃপক্ষে আমাদের, আজকের পটভূমিতে, Riba কে সাদামাটা interest না বলে usury বলে ব্যাখ্যা করতে বলবে, এমনটা আশা করা যায়।

আমার কাছে কোরআনের ২ঃ২৭৫-৭৯, ৩ঃ১৩০ এবং ৩০ঃ৩৯ -এর অন্তর্নিহিত মূল বক্তব্য অনুধাবন করে তা সমুন্নত রাখাটা অধিকতর জরুরী মনে হয় : ঝুঁকি ভাগাভাগি করে নেবার অন্তর্নিহিত মূলনীতি। বিশাল ব্যাঙ্কে ছোট সঞ্চয়ী হিসাবের বেলায় বা কিস্তিতে

www.amarboi.org

একখানা "সম্পূর্ণ বীমাকৃত" গাড়ী কেনার বেলায় এই নীতিকে অত্যন্ত জরুরী নাও মনে হতে পারে- কিন্তু সকল বড় বড় ব্যবসায় প্রকল্পে "লাভ ও ক্ষতির ভাগাভাগি" বা "ঝুঁকির ভাগাভাগি" অবশ্যই এক অবিচ্ছেদ্য নীতিনির্ধারণী বিষয় হওয়া উচিত। এধরনের নীতিমালা দাবী করতে গিয়ে, ইসলাম, পশ্চিমা ব্যবসায়ীদের তাদের অতীতের উদ্যোক্তা–সুলভ প্রেরণার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে!

এই অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়সমূহের গুরুত্ব বিবেচনা করলে, ওসবের পরে এখানে যাদু, কুসংস্কার এবং ভাগ্যগণনার মত বিষয়াবলীর আলোচনাকে গুরুত্বপূর্ণ নাও মনে হতে পারে- কিন্তু আসলে এসমস্ত বিষয়ের আলোচনাও অত্যাবশ্যক। ইসলামের প্রতি পশ্চিমের বিতৃষ্ণার মূলে অনেকাংশেই রয়েছে পীর ফকিরের কবর-পূজা সংক্রান্ত ব্যাপার-স্যাপার এবং অনেক ক্ষেত্রে যাদু,টোনা বা টোটকার মত অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষয়সমূহ।

কেউ যদি, বিশেষতঃ -Maghreb- এর "Marabout" বা পীরদের মাজারসমূহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রীতি-নীতি, আচার-আচরণ এবং "তান্ত্রিক" বিষয়–সমূহের সাথে পরিচিত হোন- তবে তার মনে হতেই পারে যে, এই ইসলাম ধর্ম এতই যুক্তি বিবর্জিত যে তা কেবল অজ্ঞানান্ধ মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কেউ যদি মরোক্কোর Fez নগরীর ঐ সমস্ত দোকানগুলোতে যান, যেগুলোতে কেবল "যাদু-টোনা"র সামগ্রী- যেমন ছোট পুতুল, যেগুলোতে সুঁচ্ ঢুকিয়ে শত্রু নিধন করা হয়, ইত্যাদি বিক্রী করা হয়- তবে তার কাছে ঐ ধর্মাবলম্বীদের সেকেলে এবং বর্বর মনে হতেই পারে।

যেমনটা সবাই জানেন, মরোক্কো এবং পশ্চিম আলজেরীয়ার "marabout" গণ বা পীরগণ একদিকে যেমন নারীর ও কৃষকের ক্ষেতের উর্বরতার নিশ্চয়তা বিধান করে থাকেন, অপরদিকে প্রেম–সংক্রান্ত জটিলতার সমাধানকল্পেও তারা সমান কার্যকরী। Tangier এর কাছে Rif পর্বতমালায় অবস্থিত সাধু Abdul Salam Ibn M'Chich (মৃত্যু ১২২৮ সাল) এর মাজারে বা Mekers এর কাছে যেখানে মরোক্কোর প্রথম মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা Idris I এর কবর রয়েছে, সেই Moulay Idris মাজারে কয়েকবার যাতায়াত করাকে অনেকেই হজ্জের সমান উপার্জন এবং হজ্জের পরিবর্তে সমমানের অর্জন বলে মনে করে থাকেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দী এবং তার পরের কিছু সূফী আন্দোলনের মাধ্যমে এই সমস্ত ভিন্নধর্মী আচার-আচরণ -যা থেকে স্পষ্টতঃ খৃষ্টান তান্ত্রিক ধারার গন্ধ পাওয়া যায়- তা ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছে। এটা তো সত্যি যে, মুসলিম সূফী তরিকাসমূহ সূফী সাধু-আশ্রিত একধরনের শক্তিশালী "ব্যক্তি-তন্ত্রের" প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে আশা করা হয় যে একজন শিষ্য বা মুরীদ তার গুরু বা শিক্ষকের কাছে নিঃশর্ত ভাবে তার সম্পূর্ণ সত্তা সমর্পণ করবে। আর সেজন্যই, অতি সংগত কারণে, পশ্চিমারা এসবের প্রতি বিতৃষ্ণ বোধ করেন।

এই উপসর্গের একটা অংশ হচ্ছে এমন জনপ্রিয় ধারণা যে, Shurufa গণ কেবল নবী (দঃ)-এর সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কের সূত্র ধরেই বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত এবং

www.amarboi.org

বিশেষ বরকতপূর্ণ জীবনধারার আশীর্বাদ প্রাপ্ত। যে কেউ নিজেকে Sharif বলে দাবী করলে, তার বংশানুক্রম নিয়ে কোন সংগত প্রশ্ন তোলা [অর্থাৎ তিনি রসূল (দঃ)-এর পরিবার-উদ্ভূত কিনা সে প্রসঙ্গে] অথবা কোন "পবিত্র মাজার"-এর [৮২]গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্নতোলাকে সৌজন্য-বহির্ভূত আচরণ বলে গণ্য করা হয়।

এধরনের ধর্মপ্রবণ এবং একই সঙ্গে বিদাতসম্পন্ন সৌজন্যই, মূলতঃ অতিরিক্ত হাঁক-ডাক সমেত মৌলুদ অনুষ্ঠানের উদ্ভবের জন্য দায়ী -যে সমস্ত অনুষ্ঠান Maghrib -এ এবং কখনো কখনো তুরস্কেও এমন পরিবেশের সৃষ্টি করে, যা দেখলে, দুঃখজনক হলেও, ক্রিস্‌মাস্-পূর্ব সন্ধ্যা বা Christmas Eve-এর কথাই মনে আসে। আমাদের প্রাণপ্রিয় নবীকে এক অতিজাগতিক সত্তা বলে প্রতীয়মান করার চেষ্টা করলে, আসলে তাঁকে যে ছোট করা হয়, এই সত্যটা মুসলমানরা কবে বুঝবে? তাঁকে আমরা যত বেশী স্বাভাবিক ও সাধারণ মানুষ হিসেবে ভাবতে শিখবো, তাঁর অর্জন এবং মর্যাদা তত বেশী আসাধারণ হয়ে উঠবে–তাই নয় কি?

যুগ যুগ ধরে, সবুজ পাগড়ী বা সবুজ শিরাচ্ছাদনের যে অপব্যবহার এবং অপব্যাখ্যা করা হয়েছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। আর বরকতের ব্যাপারে অতি ভক্তি থেকে কিভাবে মানুষ নিজেকে বিবিধ ধারণার ক্রীড়নকে পরিণত করেছে, তাও ভেবে দেখার বিষয়। আপনি যদি এখনো এসবের প্রমাণ দেখতে চান তবে, আমি পরামর্শ দেবো- একবার Fez-এ Idris II এবং Ahmad Tijani র মাজার ঘুরে আসুন। এসব মাজারের সবুজ গিলাফের নীচে, কিভাবে গায়ে টাট্টু আঁকা Berber [উত্তর আফ্রিকার জাতিগত গোষ্ঠী] লোকজন, অধিকতর বারাকাহ্ (বরকত) লাভের আশায় নিজেদের দেহকে গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে যায়, সে দৃশ্য সত্যি চাঞ্চল্যকর।

এই সব পীর-ফকিরের ভক্তি শ্রদ্ধাতে, আর কিছু না হলেও সৃষ্টিকর্তাকে বিকল্প পন্থায়, রক্ত-মাংসের এক জীবন্ত পরিচিতি হিসেবে অনুভব করার সনাতন প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তাই প্রাক্তন খৃষ্টান জনগোষ্ঠী সমূহ, যা ধর্মান্তরিত হয়ে আজ মুসলিম জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে- সে সবের মাঝে "শিশু যীশুখৃষ্টকে" অনুভব করার বিকল্প পন্থা হিসেবেই বুঝিবা আজ মুসলিম দরবেশ, পীর বা তাসাউফ সাধককের এত সমাদর।

এই ভাবধারা বরদাস্ত করা উচিত নয়, কারণ পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য মধ্যস্থতাকারী খোঁজ-করাটা ইসলামের মৌলিক নিয়ম নীতি বিরুদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আমার পরামর্শ হচ্ছে সমগ্র মুসলিম বিশ্বেরই ওয়াহাবিদের মত, সামগ্রিক ভাবে, পীর-ফকিরে (তান্ত্রিক) বিশ্বাস/আস্থা প্রত্যাখ্যান করা উচিত। তাছাড়া বর্তমান সময়ে দাওয়াতের কাজে লাগানোর উপযোগী সিরাহ্ সংকলনেও আমাদের ওয়াহাবিদের নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে, নবী (দঃ) জীবনের এমন বর্ণনা সংকলন করা উচিত, যাতে পরবর্তীকালে সংযোজিত উপকথা এবং অলৌকিক গল্পসমূহের আবর্জনা থাকবে না। [৮৪] আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবেই দাবী করে থাকি যে, ইসলাম হচ্ছে এক সংযত ধর্ম যা জ্ঞানসম্পন্ন এবং প্রাপ্ত বয়স্ক

www.amarboi.org

চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে আবেদন রাখে- আর সেজন্যই আমাদের উচিত ওয়াহাবিদের মত [উপরে উল্লেখিত বিষয়ে] পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা। সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীর অমুসলিম [৮৫] কর্তৃক রচিত নতুন সিরাহ্ গ্রন্থাবলী যেন আমাদের, অর্থাৎ মুসলমানদের, লজ্জায় না ফেলে- আমরা যেন আমাদের প্রিয় নবীর জীবনী নিয়ে উন্নত মানের সিরাহ্ সংকলন উপহার দিয়ে সেগুলোর তুলনায় গ্রহণযোগ্য, সুন্দর ও সমমানের উপস্থাপনার দাবীদার হতে পারি।

কবর ও মাজার ইত্যাদির প্রতি অতিভক্তি পরিহার করতে গিয়ে আমরা যেন আবার ইসলামের বিশাল ব্যক্তিত্বদের শেষ বিশ্রামের স্থলসমূহকে নিশ্চিহ্ন না করে ফেলি। Cairo তে Shafii র কবর বা Damuscus -এ Ibn Arabi র কবর বা Istanbul -এ নবী (দঃ) এর পতাকাবাহী Eyup (Ayyub) Sultan -এর কবর ইত্যাদির পেছনে এমন সব ইতিহাস রয়েছে, যা মুসলিম উম্মাহ্র জন্য আত্মসচেতনতার এবং গর্বের বিষয়- আর তাই এসমস্ত স্মৃতির সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

পশ্চিমা মানুষজন যে সমস্ত ব্যাপার নিয়ে মুসলিমদের বিদ্রূপের দৃষ্টিতে দেখে, তার আরেকটা সম্বন্ধে আলোচনা না করলে এই অধ্যায়ের আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে- সেটি হচ্ছে, কফির গুঁড়ার সাহায্যে (fal) ভবিষ্যত গণনার রেওয়াজ (যেমন-Turkey-তে)। পূর্বনির্ধারিত অদৃষ্টে বিশ্বাসী বলে চিহ্নিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে, আজ পর্যন্ত, কি ঘটতে যাচ্ছে সেটা আগে ভাগে জেনে নেয়ার এক দুর্বার আগ্রহ বর্তমান। কোরআনের ৫ঃ৩ আয়াতে শুকরের মাংসের পাশাপাশি, এভাবে আগেভাগে অদৃষ্ট জেনে নিয়ে অনেকটা "ঈশ্বর" বনে যাবার প্রচেষ্টাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুকরের মাংস মুসলিম জাহান থেকে অদৃশ্য হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অদৃষ্ট জানার প্রচেষ্টা এখনো সেখানে রয়েই গেছে।

এসব বলে, বহু ভাগে ইতিমধ্যেই বিভক্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে, আমি আরো নতুন বিভক্তির সৃষ্টি করতে চাই না। Sunni, Shi'ite -এবং Khariji, Ibadi -এবং Mozabite মুসলিমদের মাঝে যে বিভক্তি বা মতভেদ রয়েছে-Mu'tazilah ও Ashariyah ধারার মাঝে যে বিভক্তি রয়েছে-এগুলোই যথেষ্ট অনিষ্টকর। তদুপরি, Qadiriyah থেকে Ahmadiyah এবং Nakhshbandiyah থেকে Nurculuk পর্যন্ত বিস্তৃত তরীকাসমূহের বিভক্তি নিয়ে কি করা যায়- আমি ভেবে পাই না। আর ইসলামের রং ধারণকারী Druz, Alevites, Alawites, Qadiani র মত বিভিন্ন গোত্রসমূহের স্থানই বা কোথায় ? এছাড়া Hamas বা Jihad -এর মত বহু সংস্থা, যারা রাজনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে রত এবং যাদের "ইসলামপন্থী" (Islamist) বলা হয়, তাদের কথা তো বলাই হলো না। আর Ikhwanul Muslimun এবং Tabligh al Islami র কর্মীদের মাঝে কেমন সম্পর্ক বিদ্যমান ? আমাদের মুসলমানদের জন্য আজ এধরনের পীড়াদায়ক বহু প্রশ্ন এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা। আজ যদি কোন বহিরাগত ব্যক্তি [উদাহরণ স্বরূপ কেউ যদি ধর্মান্তরিত হবার আগ্রহ নিয়ে জানতে চায়] সত্যি বুঝতে চায়

www.amarboi.org

যে, কোন কণ্ঠকে সে সত্যিকার ইসলামের কণ্ঠস্বর মনে করবে- তবে তাকে বোধ করি এমনি অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। আর এধরনের বহু ধারায় বিভক্তি, আমাদের যে কোন প্রতিপক্ষের সাথে সংলাপের ক্ষেত্রে এক বিশাল অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কেননা কূটবুদ্ধিসম্পন্ন কোন প্রতিপক্ষ এমন একটা ছোট্ট অংশকে (ফেরকাকে) বেছে নিতে পারে, যা তাদের জন্য সুবিধাজনক হয় এবং ঐ ক্ষুদ্র অংশের মতামতের উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত তথ্য দিয়ে গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌কে "দানবীয়" বলে প্রতীয়মান করতে পারে [বিশেষতঃ প্রচার মাধ্যমে রংচং মাখিয়ে]। বিশ্বে আমাদের, অর্থাৎ মুসলিমদের, মতামতের কোন মূল্য থাকবে বা কোন ধরনের প্রভাব থাকবে- এ দুরাশা যদি আমরা পোষণ করি, তবে অন্ততঃ -গর্ভপাত, অঙ্গ সংযোজন বা টেস্ট-টিউবে নিষিক্ত ডিম্বাণুর মাতৃত্বের মত প্রধান বিতর্কিত বিষয়সমূহে আমরা যেন একতাবদ্ধ এবং একক কণ্ঠে মতামত ব্যক্ত করতে পারি, সে ব্যবস্থা করতে হবে।

সত্যি কথা বলতে কি, সবাই যদি কথা বলার সময় কেবল সেই জনসংখ্যার হয়েই কথা বলে, যাদের তারা সত্যিই প্রতিনিধিত্ব করে [অর্থাৎ সবার হয়ে কথা বলার চেষ্টা না করে, কেবল নিজ আওতাধীন জনসংখ্যার হয়ে কথা বলে]-কেউ যদি ইসলামকে Monopolize না করে বা ইসলামের উপর নিজের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে- তবেই বোধ হয় সঠিক দিকে একটা কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হবে। এসব ব্যাপার খুব সহজেই সমাধা হতো, যদি ১৯২৪ সালে খেলাফতের অবসান না ঘটতো, অথবা, পরবর্তী সময়ে মুসলিম উম্মাহ্‌ যদি শেষ খলিফার একজন উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করতে পারতো।

১৯২৪ সালের খেলাফত অবসানের আগেই Abdul Rahman al Kawakibi (মৃত্যু ১৯০২) যখন মক্কায় বসবাসরত একজন কোরাইশ খলিফার অধীনে বিশ্বের সব ইসলামী দেশগুলোর একটা নাম মাত্র বা প্রতীকী ফেডারেশন ঘটনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখনই সেটাকে অবাস্তব মনে হয়েছিল। [৮৬] মুসলিম বিশ্বের "ধর্মনিরপেক্ষতার" অগ্রপথিক, Ali Abdul Raziq (মৃত্যু ১৯৬৬) এমন এক ভাব দেখিয়েছিলেন যে, " ইসলাম ধর্মের আদি পরিকল্পনার মাঝে, একটা বিশ্বজনীন ইসলামী খেলাফতের কোন দর্শন বা চিত্র আদৌ ছিল না।"[৮৭]

১৯২৪ সালের ঠিক পঞ্চাশ বছর পরে, ১৯৭৪ সালে একজন মুসলিম নেতাকে খলিফা উপাধিতে ভূষিত করার উদ্দেশ্যে একটা বাস্তব চেষ্টা চালানো হয়েছিল। Organization of the Islamic Conference (বা OIC) এর দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে, কিছু রাষ্ট্রের প্রধানগণ সৌদি বাদশা ফয়সলকে এই সম্মান প্রদান করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন।

৪০টিরও বেশী রাষ্ট্রে ইতিমধ্যে বিভক্ত এবং আরো বিভাজনে বিভক্ত হতে ইচ্ছুক বিশ্ব–মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য একজন খলিফা নির্বাচন কোন সুফল বয়ে আনতো কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এধরনের পরিস্থিতিতে, একজন খলিফা তাঁর

www.amarboi.org

রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন না। তাঁর ভূমিকা, তখন কেবল একটা ধর্মীয় ভূমিকায় পরিণত হতো এবং তিনি অনেকটা একজন Muslim Pope-এ পরিণত হতেন।[৮৮] এর চেয়েও যদিবা অধিকতর কার্যকরী হতো, তবু, ১৯৬৯ সালে Rabat-এ গঠিত OIC-ও সমষ্টিগত ভাবে খলিফার ভূমিকা নিতে পারেনি এবং তা নেয়া উচিতও নয়।

আমাদের সোজাসাপটা স্বীকার করা উচিত যে, এই মুহূর্তে ঐ শূন্যস্থান পূরণ করার মত কাউকে আমরা দেখছি না। কিন্তু আমাদের অন্ততঃ এব্যাপারে সচেতন হওয়া উচিত যে, মুসলিম উম্মায় এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ "শূন্যস্থান" রয়েছে। আর একই সময় আমাদের আশা নিয়ে প্রার্থনা করা উচিত যে, শীঘ্রই বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক মহান ধর্মীয় নেতার অভ্যুদয় ঘটবে, যিনি হবেন একবিংশ শতাব্দীর এক Ibn Taymiyah বা Nizam al Mulk।

মুসলমানদের একতার ডাক দিতে গিয়ে আমি একথা বলছি না যে বিশ্বের তাবৎ মুসলিম জনগোষ্ঠী সবদিক দিয়ে একেবারে সুষম এবং অভিন্ন জনসংখ্যায় পরিণত হবে। এরকম ব্যাপার আগেও কখনো ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। আজ আর এব্যাপারে কেউ প্রশ্ন তুলবে না যে, Persian, Berber, Afghan এবং Turk-রাও, আরবদের মতই সত্যিকার অর্থে মুসলিম জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, Spain-এর Visigoth রাও মুসলিম জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং একইভাবে ইন্দোনেশীয়, মালয় এবং পাকিস্তানীরাও মুসলিম জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। যেমনটা আরবদের বেলায় হয়েছে- মুসলিম হতে গিয়ে তাদের ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিসর্জন দিয়ে, তারা যেমন তাদের সভ্যতাকে আবার প্রথম থেকে গড়তে শুরু করেনি- বরং যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই, সেগুলো তারা ধরেই রেখেছে - ঠিক তেমনি উপরে বর্ণিত সব জাতিগত সমষ্টিই, তাদের ঐতিহ্যগত অনেক বৈশিষ্ট্যই মুসলিম হবার পরেও ধরে রেখেছে। হিজরতের পরে, ইসলামিক পঞ্জিকা, হিজরী প্রথম বর্ষে এক "Cultural Zero Hour" বা সাংস্কৃতিক অধ্যায়ের সূচনা করেনি। আর তাই [হজ্জের মত] কোন একটা সমাবেশে, কেবল শিরাচ্ছাদন দেখেই চেনা যায়, কে কোথা থেকে এসেছে। কায়রোতে এক বিশ্ব-মুসলিম সমাবেশে, আমি একবার শুনেছিলাম যে, ঐ সমাবেশে/ সম্মেলনে যোগদানকারী সারা পৃথিবী থেকে আসা পুরুষরা বিয়াল্লিশ্ (বিভিন্ন) ধরনের টুপি বা পাগড়ী পরিহিত ছিলেন।

এই অভিজ্ঞতা থেকে একটা শিক্ষা লাভ করার রয়েছে: আজ যখন হাজার হাজার ইউরোপীয় বা আমেরিকান, শ্বেতাঙ্গ বা অ-শ্বেতাঙ্গ, ইসলামে প্রবেশ করেন, তখন তাদের ধর্মান্তর হয়তোবা, জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বা তাদের ব্যবহারে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে কিন্তু, তবু অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিচারে তারা তখনো ফরাসী, ইংরেজ, সুইস, স্প্যানীয়, কানাডিয়ান বা জার্মান থেকে যান। এদের প্রত্যেকেই নিজেদের জাতীয় ভাষায় কথা বলেন এবং পৃথিবীকে সামান্য ভিন্নতর চোখে দেখে থাকেন। আবার প্রত্যেকেই সামান্য হলেও, ভিন্নতর শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভ করে থাকেন।

www.amarboi.org

মোট কথা, মাগরেবী বা মিশরীয় রঙের ইসলামের পাশা-পাশি আজ আমেরিকান বা ইউরোপীয় রঙের ইসলামের উদ্ভব ঘটতে চলেছে। আল্লাহ্ আমাদের মাফ করুন, তা যেন " জার্মান ইসলাম" না হয়ে বরং "জার্মানীতে ইসলাম" হয় - অথবা, "আমেরিকান ইসলাম" না হয়ে বরং "আমেরিকাতে ইসলাম" হয়। এই নতুন ও সাম্প্রতিক অগ্রগতি আমাদের এ ব্যাপারটা বুঝতে সহায়তা করবে যে- ইসলামের কোন কোন বৈশিষ্ট্য আসলে সত্যি সত্যিই ইসলামের অন্তর্নিহিত বিষয় আর কোন কোন বৈশিষ্ট্য কেবলই আরব বা অন্যান্য সভ্যতা/ ঐতিহ্য থেকে এসেছে।

ইহুদী গোত্রসমূহের মতই, নাক উঁচু আরবরা নিজেদের "নির্বাচিত বিশেষ জনগোষ্ঠী" মনে করে- মক্কা ও মদীনায় গমনকারী সাব-সাহারান দেশসমূহের নাগরিকদের মতই, আরো অনেক অনারব হাজীদের মনে এমন একটা ধারণা জন্ম নিতে পারে। তা যদি হয় তবে তার পিছনে কোন কারণ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে বা মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে ভেবে তা হয়তো ক্ষমাও করা যেতে পারে- তথাপি, তা যে একটা সঠিক কাজ নয়, সেটা স্বীকার করতেই হবে।

জাতীয়তাবাদ মানুষকে অনেকক্ষেত্রেই বিপথগামী করে এবং একটা ভুল ব্যাপারেও স্বজাতি বিধায় কাউকে সমর্থন করতে উৎসাহিত করে–এ সমস্ত কারণেই মুসলিম উম্মাহ্র একতাকে ইসলাম, গোত্রীয় বা জাতীয়ভাবে একতাবদ্ধ অনুভূতির উপরে স্থান দিয়েছে (কোরআন ২৮ঃ১৫, ৪৯ঃ১৩)। শেষোক্ত আয়াতটি এব্যাপারে অত্যন্ত পরিষ্কার: " আমরা -- তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হিসেবে সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা একে অপরকে জানতে পারো। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্র চোখে তোমাদের মাঝে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ, যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্-ভীরু (বা আল্লাহ্-সচেতন)"। সুতরাং যে কোন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, এমনকি ইজতিহাদের নিরিখেও, কেবল জাতিগত পরিচয়ের জন্য কোন মুসলমানের অপর কোন মুসলমানকে হেয় জ্ঞান করা উচিত নয়।

এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা ব্যাপার যে, মুসলমানদের আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (দঃ) কে যেমন মেনে চলার তাগিদ দেয়া হয়েছে (কোর আন, ৩ঃ৩২, ৮ঃ৪৬, ২৪ঃ৬২, ২৪ঃ৫৪, ৩৩ঃ ৩৬ ও ৪৭ঃ ৩৩), তেমনি প্রথম মুসলিম (এই মহান) মানুষটিকে (কোরআন, ৬ঃ১৪, ৬ঃ১৬৩) এক আদর্শ মডেল হিসেবে অনুকরণ করতেও বলা হয়েছে (কোরআন, ৩৩ঃ২১)। অনুকরণ এবং অনুসরণ করতে গিয়ে হয়তো, তরুণ ইউরোপীয় মুসলিমদের ঠিক তাঁর মত করে পোষাক পরার, দাড়ি রাখার, খাবার এবং দাঁত মাজার প্রয়োজন হতে পারে। এভাবে, তারা যে শুধু রসূল (দঃ) অনুকরণ করবে তাই নয়, বরং তারা ৭ম খৃষ্টীয় শতাব্দীর Hijaz -এর সভ্যতার অনুকরণ করবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবটাও খুব স্পষ্ট: ইসলামকে আরবদের দ্বারা সৃষ্ট এবং আরবদের জন্য সৃষ্ট একটা ধর্ম হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে, এবং এসব তরুণ ইউরোপীয়দের মাঝে, উপকথার উপাদান মিশ্রিত এক উপ-সংস্কৃতির অংশ হয়ে যাবার প্রবণতা দেখা

www.amarboi.org

যায়। বেশ হাল্কা করে বললেও বলতে হয় যে এসবই ইসলামের জগতে মানুষকে দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে।

পশ্চিমে ইসলাম সম্বন্ধে যে ধ্যানধারণা প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের উপর, এই অধ্যায়ে আগাগোড়া আলোকপাত করা হয়েছে- বিশেষতঃ দুই জগতের [পশ্চিমা জগত ও ইসলামী জগত] মাঝে যোগাযোগের ইস্যুগুলো আলোচনা করা হয়েছে। নিজেদের আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করার ব্যাপারে মুসলিম জগত যে অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে, একথা বলে আমি কাউকে অপমান করিনি আশা করি। আরব-বিদ্বেষী শক্তিগুলোর প্রচারণার সর্বোত্তম সামগ্রী, যা তারা আকাঙ্খা করতে পারে, তার একটি বলা যায় টেলিভিশনে খোঁচা খোঁচা দাড়ি সম্বলিত ইয়াসির আরাফাতের ছবি, যার কোমরের বেল্টে একটা পিস্তল থাকে- উপরন্তু এমন মোক্ষম এক প্রচার সামগ্রীর জন্য কোন পয়সা খরচ করতে হয় না। কোন তৈলকূপের আশেপাশের তাঁবুতে সোনালী চুলের সুন্দরীকে বন্দী করে রাখা কামুক আরব ব্যক্তির পুরানো যে বর্ণনা বা দৃশ্য পশ্চিমা মানসপটে অঙ্কিত রয়েছে, তা ছাপিয়ে সম্মানিত মার্জিত আরব শেখদের ইমেজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

উপরোক্ত বর্ণনা এবং অন্যান্য সৃষ্ট ইমেজ যেমন উগ্রকামী, বিশ্বাসঘাতক, খুনী বা রক্তলিপ্সু, নির্বোধ ইত্যাদি- বলতে গেলে প্রাচ্যে প্রদর্শিত প্রতিটি Hollywood চিত্রেই, [একজন আরবের এধরনের ইমেজ], দেখা যাবে। চিত্রে ধারণকৃত এই ধরনের বৈষম্যমূলক ও বিদ্বেষী বক্তব্য, অবশ্যই যথাশীঘ্র সম্ভব সমগ্র মুসলিম বিশ্বে রফতানী করা হয়। তাই একথা বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না যে, গণসংযোগে মুসলিম বিশ্ব বিশাল ব্যবধানে পিছিয়ে আছে। London ভিত্তিক MBC আরবী ভাষায় যে প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে, ঐ একই ধরনের সম্প্রচার বৃটিশ, ফরাসী, জার্মান, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান এবং আমেরিকান টেলিভিশনে বেশী বেশী করে করা উচিত।

এটা স্বীকার করতে হবে যে, মুসলিম সূত্র উদ্ভুত অর্থবহ বেশ কিছু সাহিত্যের সামগ্রী পশ্চিমা দেশসমূহে পাঠানো হয়েছে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এসব সামগ্রীর বেশীর ভাগই যে কেবল নিম্নমানের কাগজ, ভুল ইংরেজী বা অবিশ্বাস্য রকমের ছাপার ভুলের জন্যই কার্যকারিতা হারায় তাই নয়, উপরন্তু, সাধারণতঃ এগুলো ধর্মান্তরিত মানুষদের উদ্দেশ্যে রচিত বলে দৃষ্টিভঙ্গীর ত্রুটি-জনিত কারণেও এগুলোর কার্যকারিতা [দাওয়াতের বিষয়ে] কমে যায়।

কোরআন থেকে "আল্লাহ্‌র বাণী" উদ্ধৃত করে আমি কিভাবে কাউকে বিশ্বাসীদের দলে টানবো, যদি তার মূলতঃ এই বিশ্বাসই না থাকে যে, এমন একজন ঈশ্বর রয়েছেন যিনি কথা বলতে পারেন বা যার কাছ থেকে বাণী অবতীর্ণ (কোরআন) হতে পারে ?

একজন মুসলিমের কাছে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যে সকল যুক্তি প্রহণযোগ্য, সেগুলো সাধারণত: পশ্চিমা পটভূমির একজন নাস্তিকের কাছে অপ্রতুল। ঐ নাস্তিক তার স্কুল জীবনে Immanuel Kant এর রচনা পড়ে জেনেছে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ নেই। আর ঐ শিক্ষাটা এমনই একটা শিক্ষা যা সে

www.amarboi.org

কখনোই ভুলবে না। প্রাচ্যের একজন লেখকের কাছে মুসলিম বিশ্বে কোন আত্মস্বীকৃত নাস্তিকের দেখা পাওয়াটা বেশ বিরল একটা ঘটনা, আর সেজন্যই এই বাস্তবতাটা হয়তো তার দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে যে, পশ্চিমা জগতের অবস্থাটা ঠিক তার উল্টো: পশ্চিমা জগতে একজন আত্মস্বীকৃত বিশ্বাসী পাওয়াটাই একটা বিরল ঘটনা।

সুতরাং, আমাদের উচিত এমন যুক্তি-তর্ক ও ভাষা ব্যবহার করা যা পশ্চিমা মন-মানসের উপযোগী, আর তা সবচেয়ে ভালো করতে পারবেন পশ্চিমা দেশসমূহে বড় হওয়া মুসলিমগণ। তারা যে সমস্ত যুক্তি-তর্ক নির্বাচন করবেন সেগুলো জ্ঞানভিত্তিক, সৌন্দর্য্য বোধভিত্তিক, নৈতিক এবং ইতিহাসভিত্তিক হতে হবে- বলাবাহুল্য, জীবনের প্রতি মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গীর একটা আদর্শ উদাহরণও সেই সঙ্গে উপস্থাপন করতে হবে।

www.amarboi.org

৭ম অধ্যায়

আমাদের করণীয়: কি বিশাল দায়িত্ব!

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে যে সমস্ত পরিবর্তনের প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে সেগুলোর আশু বাস্তবায়ন প্রয়োজন-ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং এর ভাবমূর্তির উন্নতি করতে, তথা "দাওয়া" বা ইসলামের পথে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাতে এর বিকল্প নেই।

এই বিষয়ে আমিই যে প্রথম পরামর্শ দিচ্ছি তা নয়। বরং মুহাম্মদ আসাদ [৮৯] সহ জামাল আল বান্নাহ্ [৯০], হামিদ সুলায়মান[৯১] এবং হুসাইন আমিন (যিনি আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত জীবনে আমার সহকর্মী ছিলেন)-এর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। Husayn Amin-এর সাহসী বই ***Sabil al Muslim al Hazin Ila Muqtada al Suluk fi al Qarn al Ishrin*** (1983) [৯২], সংশ্লিষ্ট সবার মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করা উচিত। তাছাড়া আমাদের সামনে যে বিশাল করণীয় ব্যপারসমূহ রয়েছে, সে সবের জন্য সামান্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার চেয়ে বেশী কিছু করার যোগ্যতাও আমার নেই। এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করতে হলে, কোনরকম রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সীমাদ্ধতা ছাড়াই, বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রের জ্ঞানী এবং নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানদের যৌথ ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে।

তবে বোঝাই যাচ্ছে যে এটা তেমন সহজ কাজ নয়। একটা সুদৃঢ় নীতিগত ভিত্তির উপর নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গী এবং মূল্যবোধের মৌলিক পরিবর্তন সাধন ছাড়া, পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর প্রস্তাবনাসমূহের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে, ইসলামকে নতুন প্রসাধনীর মাধ্যমে সাজিয়ে তোলাটা আমাদের লক্ষ্য নয়। বহিরাগত বৈশিষ্ট্য, মরিচা এবং জরাজীর্ণ বহিরাবরণ ঘষে মেজে পরিষ্কার করে আমরা ইসলামকে আরো শক্তিশালী, গতিশীল এবং প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চাই। বিশেষতঃ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের মাঝে সংশয়ের অবসান ঘটানো একান্ত প্রয়োজন- আমরা যেন এসব বিষয়সমূহকে গুলিয়ে না ফেলি:

* ইসলাম ধর্ম এবং ইসলামী সভ্যতা।
* ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় এবং স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ।
* ঐতিহ্য এবং Taqlid (বা অন্ধ অনুকরণ)।
* সহীহ্ এবং দুর্বল হাদীস।

www.amarboi.org

* শরীয়াহ এবং ফিক্‌হ।
* কোরআন এবং সুন্নাহ্।

ঐতিহ্যের কোন অংশটুকু এই মহান ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ আর কোন অংশটুকু নয়, কতটুকু অত্যাবশ্যকীয় এবং কতটুকু নয়, এসবের সঠিকতা নির্ধারণকল্পে উন্নততর মাপকাঠি উদ্ভাবন করাটা একান্ত প্রয়োজনীয়।

আংশিক অথবা সম্পূর্ণ ভাবে, মেয়েদের মুখ ঢেকে চলার যে রেওয়াজ- তা সম্ভবতঃ কোন সভ্যতা বা ঐতিহ্যকে ধর্ম হিসেবে ধরে নেওয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এখনো জেদ্দার পথে এমন মহিলাদের দেখতে পাওয়া যায়, যারা নিজেদের চার ভাঁজ কাপড়ের আড়ালে ঢাকতে গিয়ে নিজের এবং রাস্তার চলমান যানবাহনের জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়ে থাকেন। একটা চোখ ছাড়া নিজের মুখের কোন অংশ উন্মুক্ত থাকলে, Ghardaia র নিকটবর্তী Beni Usguen বা El-Atuef (M'zab, Algeria) এলাকার মেয়েরা নিজেদের পরিচ্ছদকে অপর্যাপ্ত বা অশালীন মনে করে থাকে। আর এমন মমির মত সর্বাঙ্গ ঢেকে থাকার পরও, পথে যদি তারা কোন পুরুষের মুখো-মুখি হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তারা পার্শ্ববর্তী দেয়ালের দিকে তাদের মুখ ঘুরিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায়। [৯৩] ইয়েমেনে এখনো মেয়েদেরকে একধরনের চামড়ার মুখোশ দিয়ে তাদের নাক এবং মুখ ঢেকে রাখতে দেখা যায়।

এ বিষয়ে ১৯৮৯ সালে আমি যখন Al Azhar -এর Shaykh (ধর্মীয় নেতা) Gadd al Haqq -এর সাথে আলোচনা করি তখন তিনি আমাকে বলেন, যে ঐ সমস্ত আচার-আচরণ " ইসলামিক নয়, তবু সম্পূর্ণ অনৈসলামিকও নয়"- যা থেকে আমি এটুকুই বুঝেছি যে, শুধু বহু বছর যাবত পালিত হয়ে আসলেই অনেক সময় অনেক সামাজিকতা এক ধরনের আইনগত বৈধতা লাভ করতে পারে। এধরনের বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমার উত্তর হচ্ছে যে, *কোরআন মেয়েদের যে স্বাধীনতা দিয়েছে, কোন সামাজিক আচার-আচরণই সম্ভবতঃ সেটাকে বাতিল করে দিতে পারে না।*

এভাবে, ধর্ম এবং সভ্যতা বা ঐতিহ্যকে পৃথক করার একটা প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সদা এবং সর্বত্র বিরাজমান এক আল্লাহ্‌র প্রতি প্রগাঢ় ও নির্ভেজাল বিশ্বাস এবং তাঁর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ হিসেবে ইসলাম ধর্মকে, আমাদের এই বর্তমান যুগে, পৃথিবীর কাছে প্রকাশ করতে চাইলে (তুলে ধরতে চাইলে), আমাদের উচিত একটা পালিশ করা রত্নের মত ইসলামকে ঝক্‌ঝকে করে তুলতে এর উপর থেকে আঞ্চলিক এবং ঐতিহ্যগত আচরণ বা স্তরসমূহ ঝেড়ে ফেলে দেয়া।

সৌদি সাময়িকী Arab News ও al Muslimoon-এর প্রশ্নোত্তর কলাম থেকে অনুবাদ করে, Muslim League -এর জার্মান শাখার মুখপত্র DML-Rundbrief-এ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। উত্তর নয়, তবে প্রশ্নগুলো সত্যিই অভাবনীয় ! নিম্নে, সৌদি আরবের মুসলিম ভাইদের কি ধরনের জিজ্ঞাসা পীড়া দিয়ে থাকে, তার সংগৃহীত নমুনা পেশ করা হলোঃ

www.amarboi.org

* একজন অ-মুসলিমকে স্পর্শ করলে কি নতুন করে অজু করতে হবে ?

* সঙ্গীত কি একজন মুসলমানের জন্য বৈধ ?

* একজন মুসলিম কি বিদেশী আইনের উপর শিক্ষা লাভ করতে পারে ?

* কোন লোকালয়ে আস্‌সালামু আলাইকুম বলা নিষেধ ?

* কারো চুলের রং কি তার অজু নষ্ট করে দেয় ? (কলপ)

* ধূমপানে কি অজু নষ্ট হয় ?

* একজন মুসলিম কি তার দাঁতের সুরক্ষার জন্য স্বর্ণের আবরণ গ্রহণ করতে পারে?

* একজন মুসলিম কি এলকোহল মুক্ত বিয়ার পান করতে পারে ?

* একজন মুসলিমের কি এলকোহল যুক্ত সুগন্ধী বা প্রসাধনী ব্যবহার করা সিদ্ধ ?

* শুকর থেকে সংগৃহীত Gelatin যুক্ত কস্‌মেটিক সামগ্রী ব্যবহার করা যাবে কিনা?

* কেউ যদি স্বভাবগত ভাবে বাম হাত ব্যবহার করে (Left-Handed), সেটা কি ইসলামিক ?

* একজন অ-মুসলিমকে কি কোরআনের এক খানা কপি দেয়া যাবে?

* জন্মদিন উদ্‌যাপন করা কি জায়েয?

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর মাধ্যমে আবশ্যক ও অনাবশ্যক বিষয় আলাদা করার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, আমি সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি।

এধরনের তালমুদীয় প্রশ্নের মুখোমুখি হলে আমার উত্তর হতো: "আমি সত্যিই চেষ্টা করছি, আপনার সমস্যাগুলোকে বুঝতে -আমার তো আপনার মত এধরনের কোন সমস্যা নেই।" এরপরে হয়তো আমি পাল্টা প্রশ্ন করতাম:" আল্লাহকে আপনাদের কি ধরনের ঈশ্বর মনে হয়- এক পেশাদার হিসাবরক্ষক ? ইসলামকে আপনাদের কি ধরনের ধর্ম মনে হয়- আইনজীবিদের (পেশার) জন্য এক স্বর্গ বিশেষ?"

কিন্তু হায়, দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, মিস্‌ওয়াক দিয়ে দাঁত মাজা, প্রথমে ডান পায়ের জুতা পায়ে ঢোকানো বা ঠিক মত গোঁফ ছাটা, এসব ব্যাপার যেন, ইসলামের জীবনযাত্রার মৌলিক দিকগুলোর চেয়ে, অনেকের কাছেই বেশী প্রাধান্য পায় এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয় (যেন এসব মেনে চলা মানেই ভালো মুসলমান বলে গণ্য হওয়া)-এমনকি কিছু নতুন ধর্মান্তরিত মুসলমানদের এমন করতে দেখা যায়। আমরা সবাই, মুসলমানদের বরং ধৈর্য্য, দানশীলতা, সহিষ্ণুতা, দয়া এবং প্রার্থনায় একাগ্রতার মত চারিত্রিক গুণাবলীতে গুণান্বিত দেখতে পছন্দ করবো। তাই নয় কি?

আমি আগে যেমন বলেছি, অন্ধ অনুকরণ-এর স্পৃহাটা যেন আমাদের মাঝে রয়েই গেছে, যদিও কাগজে কলমে Ijtihad-এর দ্বারা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রয়েছে। [নতুন নতুন ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে মনে হলেও, আমরা পুরানো অন্ধ অনুকরণের ঐতিহ্যই বজায় রেখেছি]।

এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, আমরা মুসলিম আইনের চারটি প্রধান ধারার (মাযহাব) প্রবর্তকদের আর্শীবাদ পুষ্ট। তারা এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন যে, লিখিত

www.amarboi.org

হবার পর থেকেই আইনের অনুশাসনসমূহ যেন নিজেরাই জীবনধারণ ও জীবনযাপন করতে শুরু করে। কোন প্রজন্মের আইন-শাস্ত্রবিদরাই, দূরদর্শিতার বলে, আগামী সফল প্রজন্মসমূহ কি সব সমস্যার সম্মুখীন হবে তা দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পান না এবং সেজন্যই ঐ সমস্ত (নতুন) সমস্যার সমাধানকল্পে কোরআনিক নীতিমালার কোন আঙ্গিকগুলো প্রযোজ্য হবে, তাও আগেভাগে জানা সম্ভব নয়। সময়ের সাথে সাথে আইন যে পরিবর্তন হতে পারে, এ ব্যাপারটা যেন ইসলামী আইনশাস্ত্রের মৌলিক বিবেচ্য বিষয়সমূহের একটি হয়। সুতরাং, মুসলমানদের প্রতিটি প্রজন্মই যেন, নিজেদের প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের অবস্থায় দেখতে পায়। মায্হাব সৃষ্টির আগে, হাদীস সংকলনের আগে অথবা সুন্নাহ্র (বর্তমান) ধারণা সৃষ্টি হবার আগে–এ সমস্ত প্রথম প্রজন্মের মুসলমানদের তাদের নিজেদের সর্বোত্তম জ্ঞান ও বিচারের ভিত্তিতে কাজ করতে হতো। আর আমাদেরও ঠিক তাই করা উচিত। নিজের সাহস দেখে আমরা যেন ভীত না হয়ে পড়ি।

মুহাম্মদ (দঃ) যা বলেছেন, করেছেন এবং অনুমোদন করেছেন, সে সবের সংগ্রহ, সংকলন এবং বিন্যাস করতে গিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা যা অর্জন করেছেন তা যে কোন "আধুনিক" মুসলিমের প্রশংসার দাবীদার। উপরন্তু, কোন মুসলিমই এটা অস্বীকার করতে পারবে না যে, নবী (দঃ) যে কেবল ওহী পৌছে দিয়েছেন আমাদের কাছে–তাই নয় বরং সে সমস্ত বাণী তিনি আমাদের জন্য ব্যাখ্যা করে গেছেন, এমনকি তার ব্যবহারের মধ্য দিয়েও তিনি সেগুলোকে আমাদের জন্য ব্যাখ্যা করেছেন।

কিন্তু একই সময়ে সুন্নী, শিয়াহ্ ও ইবাদী মুসলিমগণ যে হাদীসের একই সংকলনকে সঠিক মনে করে না বরং প্রত্যেকেরই (প্রত্যেক দলেরই) নিজস্ব সংকলন রয়েছে–এবং সে সমস্ত সংকলন একে অপরের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়- একথাটা স্বীকার করলে আমরা সততার পরিচয় দেব। আর অবশ্যই আমরা যখন জানি যে বুখারী এবং মুসলিমের মত জ্ঞানী ও পরহেজগার ব্যক্তিদের হাদীসের সংকলন থেকে, জাল হাদীস ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করতে কি দারুণ সংগ্রাম করতে হয়েছে- তখন তারা যে সম্পূর্ণ সফল হয়েছিলেন, তাই বা আমরা কি করে নিশ্চিত হই?

আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক ও সামাজিক ইতিহাস–ভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে যতদূর যাওয়া যেত- সাহাবীদের প্রতি শ্রদ্ধা, isnad (সূত্রের ধারা বা ক্রম) ও matn (বক্তব্য) -এর উপর ভিত্তি করে সংকলিত ছয়টি গোঁড়া হাদীস সংকলনের বিশ্লেষণ ততদূর যায়নি, বিধায় সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

নবী (দঃ) -এর মৃত্যুর পরবর্তী দুই শতাব্দীতে যে, শত সহস্র জাল হাদীস মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল, এই বাস্তবতাটুকু মনে রেখে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে সুন্নাহ্কে যতটুকু নির্ভরযোগ্য জানলে আমরা সবাই খুশী হতাম–তা ততটুকু নির্ভরযোগ্য নয়। আমরা না হয় একটু কঠোর অবস্থানই গ্রহণ করি: কেউ যদি matn বা বক্তব্য (বিষয়বস্তু) জাল করার মত চালাক ও নিষ্ঠুর হয় (তা রাজনৈতিক কারণেই হোক, আর "ধর্মীয় " কারণেই হোক) , তবে সে কি isnad বা সূত্রের ধারা জাল করার মত ধূর্ত ও নিষ্ঠুর হতে পারে না?

www.amarboi.org

আলী (রাঃ) বা মুয়াবিয়াহ (রাঃ)-এর পক্ষে কোন কোন রাজনৈতিক হাদীসের বেলায় অথবা নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্যের পক্ষে বিশেষ কিছু হাদীসের বেলায় কি আমাদের সবার একটু খট্‌কা লাগে না? আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসসমূহের বাস্তবতা নিয়ে কি আমরা অধিকতর "স্বস্তি" বোধ করি না? একই সময় প্রিয় আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত কিছু হাদীসের, শিশু সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বর্ণনা নিয়ে কি আমরা মৃদু হাসি না ?

Fatima Mernissi-র [৯৪] মত মানুষ-জন নয়, বরং সত্যিকার জ্ঞানীজন যারা, তাদের উচিত অত্যন্ত সাবধানতার সাথে,কি Sahih বা শুদ্ধ এবং কি Daif বা দুর্বল তা পুনরায় নির্ধারণ করা এবং তা করতে গিয়ে তারা যেন শৈল্য চিকিৎসকের মত সুনিপুণ পদ্ধতির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন-কুড়ালের মত স্থূল যন্ত্রপাতির পদ্ধতি যেন পরিহার করেন। আমরা যদি এই করণীয়টুকু ঠিক মত সারতে না পারি, তবে Roger Garaudy র মত আরো অনেক ইউরোপীয় বা আমেরিকান মুসলিম, প্রতিনিয়ত তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, কেবল মাত্র কোরআনের ভিত্তিতে সকল যুক্তি প্রদর্শনের নীতিতে, তার দলে যোগ দেবার উৎসাহ পাবেন। [৯৫]

Shariah -র ধারণাটাকে তার আদি অর্থ ফিরিয়ে দেয়াটাও একই ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা করণীয়- যা শুরুতে ছিল কোরআনের মাপকাঠি। এভাবে, Fiqh শব্দটি সংরক্ষিত থাকবে, কোরআন ও সুন্নাহ্‌র উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ইসলামিক আইন ও বিচার বিভাগীয় নীতিমালার সামগ্রিক সমষ্টির জন্য।

এ ব্যাপারটা কোন অলস প্রচেষ্টা নয়, বরং ইজতিহাদের প্রথম ধাপ হিসেবে, মধ্য যুগীয় বিচার ব্যবস্থায় রেখে যাওয়া বিশাল সংখ্যার আইন-সংক্রান্ত সামগ্রীর গায়ে আঁটা ধর্মীয় পবিত্রতার লেবেল অপসারণের প্রচেষ্টা। এটা যেমন নতুন ব্যাপার নয় বরং, আজ থেকে ত্রিশ বছরেরও বেশী সময় আগে Md. Asad যে আহ্‌বান জানিয়ে ছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি–সামান্য কিছু সংখ্যক চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় ঐশ্বরিক অনুশাসনাবলী যা কোরআনের প্রশ্নাতীত বাণীতে পাঁওয়া যায়, তার সাথে শ্রদ্ধেয় Fuqaha দের আইন সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ অধিকাংশ আইন কানুন ও অনুশাসন, যা মানুষের তৈরী এবং যা তুলনামূলক ভাবে কম শক্তিশালী সূত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরী–তার একটা পার্থক্য বিধান করা উচিত।

এ সব করতে গিয়ে আমরা মতাদর্শ যাচাইয়ে শেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে পৌছে যাই: কোরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিতর মর্যাদার সম্পর্ক।

কেউ মনে করতে পারেন যে, এ ব্যাপারটা যেহেতু সকল বিতর্কের উর্ধ্বে যে কোরআন হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ্‌র কথা, যা কিনা অহী নাযিল হবার সাথে সাথেই অত্যন্ত যত্ন সহকারে ও বিশ্বস্ততার সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল- অথচ সুন্নাহ্, এমনকি হাদীসে কুদ্‌সীও-এমন শব্দাবলীর দ্বারা গঠিত, যা নবী (দঃ) -এর বাণী এবং যা কয়েক শতাব্দী পরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। একথাটা মনে রাখলে, কেউ যখন ভাবে যে কোরআনের কিছু নির্দিষ্ট আয়াতের

www.amarboi.org

চেয়ে, সুন্নাহ্‌র নির্ভরযোগ্যতা বেশী, তখন তাকে নির্বোধ বলতে হবে। অথচ কিছু উলেমা এমন দৃষ্টিভঙ্গীই পোষণ করে থাকেন।

এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে Zina বা বিবাহ-বহির্ভূত যৌনসংসর্গের শাস্তির বিধান- কেউ কেউ মনে করেন এক্ষেত্রে পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যু হচ্ছে প্রাপ্য শাস্তি (যেমনটা বাইবেলে আছে)। যদিও কোরআন নির্দিষ্ট ভাবে এ ব্যাপারে কেবল ১০০ দোররার কথা বলে (১৭ঃ৩২, ২৪ঃ২)।[৯৭] একবার আল্লাহ্‌ যখন স্পষ্টত চাবুক বা বেত্রাঘাতের কথা বলেছেন, তখন কোন ফকীহ্‌ কি করে হাদীসের [৯৮] উপর ভিত্তি করে তার পরিবর্তে মৃত্যুদন্ডের বিধান জারী করেন? এমনটা কখনোই ঘটতো না যদি ইসলামী ধর্মীয় আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানসমূহ, ইসলামের প্রাথমিক উৎস কোরআন এবং তার দ্বিতীয় অনিবার্য উৎস সুন্নাহ্‌র মাঝে মর্যাদার যে তারতম্য রয়েছে, সেটা মেনে চলতো।

এ অধ্যায়ে যে সমস্ত ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া হয়েছে, সব না হলেও, তার অন্ততঃ কিছু কিছু বিষয় সম্ভবতঃ প্রবল আপত্তির সম্মুখীন হবে। Fuqaha বা ফিক্‌হ্‌ শাস্ত্র-বিদদের তরফ থেকে প্রতিরোধ আশা করা যায়, যারা সঙ্গত কারণেই বিদাত সম্বন্ধে ভীত- যদিও তারা নিশ্চয়ই ভালো করেই জানেন কোনগুলো Bidah hasanah বা মঙ্গলজনক বিদাত। এরাই হচ্ছেন সে সব লোকজন, যারা বেশ নিষ্পাপ ভাবেই ইসলামী বিশ্বকে পরবর্তী কালের মানসিক স্থবিরতার মাঝে ঠেলে দিয়েছিলেন- ঔপনিবেশীকরণ প্রক্রিয়ার আক্রমণের মুখে ইসলামের প্রতিরক্ষাকল্পে উদ্ভূত সনাতন Bunker mentality বা পরিখায় লুকানোর মনোবৃত্তি থেকেই তারা এমনটা করে থাকবেন।

এটা নিশ্চিত যে, ইজতিহাদের দ্বার যে এখনো বন্ধ এ ব্যাপারটাকে আজ হয়তো কেউ প্রকাশ্যে সমর্থন করে সাফাই গাইবেন না। কিন্তু, শিয়াহ্‌ ও সূফীদের বহির্ভূত, খুব কম সংখ্যক সমকালীন উলামাই ইজতিহাদের উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে যাবার সাহস দেখাবেন। এরপর প্রাতিষ্ঠানিক বা স্ব-আরোপিত সেন্সরশীপ বাকী কাজটুকু সমাধা করে।

গত ১৪ শতাব্দী ধরে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিভিত্তিক উন্নতির উপর, যে সমস্ত মূল্যবান নথিপত্র রয়েছে সেগুলো একটু ঘেঁটে দেখুন[৯৯]। এই বইগুলোর শেষ অধ্যায়গুলোই যে তাদের সমাপ্তির অধ্যায় হয়ে বহুযুগ যাবত থাকবে, আমি সেটা বিশ্বাস করতে পারি না। [অর্থাৎ এর পরে যে আরো নতুন নতুন উন্নতির খবর থাকবে না সেটা লেখক বিশ্বাস করতে চাননা]। কিন্তু উপরে বর্ণিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে, ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের প্রাণবন্ত পরিবেশ বুঝি, ঐতিহ্যবাহী মুসলিম শিক্ষার কেন্দ্রসমূহের পরিবর্তে আজ Los Angeles, Washington, Leicester, Oxford, Cologne এবং Paris-এর মত স্থানগুলোতে পাওয়া যাবে।

আজ তাই একবিংশ শতাব্দীতে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের শিখা, Dar al Islam এর বাইরে কর্মরত উপযুক্ত মুসলিম চিন্তাবিদদের গবেষণার ফলে

www.amarboi.org

প্রজ্জ্বলিত হবে এবং দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে, এমন আশা করাটা অসঙ্গত নয়।

কিন্তু আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভালো জানেন। আমরা আল্লাহ্র উপর আস্থা রাখি এবং তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।

পাদটিকা

১। A.J. Wensinck, Concordances et indices de la tradition musulmane, 8 vols. Leiden : 1962-1992, 1,500(.. wa yahlifuna wa la Istahlafuna...)

২। No. 188.

৩। Wensinck, Concordance, 4:70a.

৪। It is perhaps significant that this hadith is not reported by al Bukhari and Muslim. However, it is found in the four other sahih compilations of Abu Dawud, al Tirmidhi, al Darimi and Ibn Hanbal.

৫। Wensinck, Concordance, 1:324 (... man yushaddidu...)

৬। Shaykh Muhammad "Abduh, Risalat al Tawhid (Cairo: 1897).

৭। Maurice Bucaille, The Bible, The Qur'an and Science, 5th ed. (Paris : 1988), chapter 7; Maurice Bucaille, The Qur'an and Modern Science (Riyadh :n.d.), 16; and Mohamed Talbi et Maurice Bucaille, Reflections Sur le Coran (Paris :1989), 233-34.

৮। Johann Ludwig Burckhardt, In Mekka and Medina (Berlin: 1994).

৯। Richard Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Madina and Meccah, 2 vols. (New York :1964).

১০। Heinrich von Maltzan, Meine Wallfahrt nach Mekkah (Tubingen:1982).

১১। Bruno Etienne, Abdelkader (Paris : 1994).

১২। Ahmed von Denffer, "Der Islam und Goethe," 20 installments, Al-Islam, (Munich) no.1 (1990) and no.3 (1994).

১৩। The Five Tracts of Hassan al-Banna (Berkeley and Los Angeles: 1978), are still basic material.

১৪। See the article "Anzahl der Muslime in der Welt," DLM-Rundbrief (Hamburg), (February 1991).

১৫। In view of these and other circumstances, Karl Deschner gave his critique of Church history the title Kriminalgeschichte Des Christentums (Criminal History of Christendom), 2 vols. (Reinbek: 1986-88).

www.amarboi.org

১৬। Gerd Ludemann, Die Auferstehung Jesus (The Ascension of Jesus) (Gottingen : 1994).

১৭। John Hick, "Wahrheit und Erlosung im Christentum und in anderen religionen," Religionen im Gesprach, vol.2 (Balve: 1994) : 113-27.

১৮। Dschelaladdin Rumi, Aus dem Diwan, trans. Annemarie Schimmel, (Stuttgart :1964).

১৯। Murad Wilfried Hofmann, Islam:The Alternative (Reading : 1993) (Arabic version Munich/ Kuwait : 1993).

২০। N. Ross Reat and Edmund Perry, A World Theology (Cambridge, UK:1992).

২১। Ziauddin Sardar, Barbaric Others: A Manifest of Western Racism (London: 1993).

২২। Robert Corfe, Righteousness Triumphant: An App[roach to a Unifying World Religion (1992).

২৩। In the footsteps but not necessarily with the approach of Muhammad Iqbal.

২৪। Jalal Ahmad, "Occidentosis:" A Plague from the West (Berkeley: 1982).

২৫। Stephen W.Hawking, A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes (New York: 1988).

২৬। Among them are such famous brain researchers as Noble Prize winner John. C. Eceles (The Self and its Brain: An Argument for Interactionalism, [New York: 1977]) and French philospopher Jean Guitton (Dieu et al science [Paris :1991]) in discussion with Grichka and Igor Bogdanov.

২৭। Richard Swinburn, The Existence of God (Oxford:1979).

২৮। Hans-Peter Durr, ed., Physik und Transzendenz, (Munich: 1986); Brigitte Falkenburg, Teilchenmetaphysik, Zur Realitatsauffassung in Wissenschaftsphilosophie und Mikrophysik (Mannheim: 1994).

২৯। Jurgen Habermas, Der Philosophische Diskurs der Moderne (Frankfurt: 1985).

৩০। Typical of this type of disinformation is Willy Dietl's "Heiliger Krieg fur Allah", (Munich:" 1983).

৩১। Amin Maalouf, Les Croisades vues par les Arabes (Paris:1983).

৩২। Hean Brignon et al., Histoire du Maroc (Casablanca: 1967), 196, 209-10.

৩৩। Karen Armstrong, Holy War: The Criusades and Their Impact on Today's World (New York: 1988).

৩৪। Akbar S. Ahmad, "Bosnia: The Last Crusad," The Arab Review (london: 1993).

www.amarboi.org

৩৫। James and Mart Hefley, Arabs, Christians and Jews: Whose Side is God on? (Hannibal, MO: 1991)
৩৬। The Nazis Used this term to refer the demolition of Jewish property, organized by them all over Germany, on 9 November 1938.
৩৭। David Pryce-Jones, At War with Modernity: Islamic Challenge to the West (London: 1992).
৩৮। Wilfried C. Smith, in What is Scripture? (London: 1993)
৩৯। Jostein Gaardner, Sofies verden (Oslo: 1991)
৪০। Salma al Khadra' al Jayyusi, ed. The Legacy of Muslim Spain (Leiden and New York: 1992); Sigrid Hunker, Allahs Sonne ubr dem Abendland, Unser arabisches Erbe (Stuttgart: 1960).
৪১। Rifa'ah al Tahtawi, Takhlis al Ibriz fi talkhis Bariz (Cairo: 1833).
৪২। Ahmida an Naifar (b. 1942), "Al Islamiyun," Majallah 15-21, no.7, (Tunisia: 1984).
৪৩। Abdoldjavad Falaturi et al., Analyse der Karholischen Religionbuscher zum Thema Islam (Braunschweig: 1988).
৪৪। Abdoldjavad Falaturi and Udo Tworuschka, Der Islam in Unterricht (Braunschweig: 1991).
৪৫। 'Abdul Hamid Abu Sulayman, Crisis in the Muslim Mind (Hemdon, VA: International Institute of Islamic Thought, 1993).
৪৬। I like to call this the "qala.....qala.....qala.....syndrome."
৪৭। Maryam Jameelah, Muslim World Book Review 6, no. 3 (Leicester 1986).
৪৮। M. Savary, Le Koran (Paris : 1893)
৪৯। Lazarus Goldschmidt, Der Koran, (Berlin : 1920).
৫০। Max Henning, Der Koran, rev. Annemarie Schimmel (Stuttgar: 1962).
৫১। O. Pesle and Ahmed Tijani, Le Coran, 3d ed. (Paris : 1954).
৫২। Rudi Paret, Der Koran (Stuttgart : 1979)
৫৩। Muhammad Hamidullah, Le Saint Coran 13th ed. (brentwood, MD: 1985)
৫৪। Hamza Boubakeur, Le Coran, vol. 1 (Paris : 1972)
৫৫। Denise Masson and Sobhi El-Saleh, Essai d'interpretation du Coran inimitable (Beirut: 1985)
৫৬। Le Saint Coran et traduction en langue francaise du sense de ses versets (Madinah:n.d.)
৫৭। Sadok: Mazigh, Le Coran 9paris: 1985)
৫৮। Muhammad Asad, The Message of the Qur'an (Gibraltar: 1980) also see Fathi Osman, Muslim Women (Los Angeles n.d.), 47-48.

www.amarboi.org

৫৯। T.B. Irving. The Qur'an (Brattleboro, VT. 1985)
৬০। A. Yusuf 'Ali, The Holy Qur'an, 7th ed. (Brentwood, MD: 1983).
৬১। Jacques Berque, Le Coran (Paris : 1990).
৬২। Adel T. Khoury, Der Koran (Butersloh: 1987).

৬৩। This is the translation given by M.Ahmad Rassoul, Al-Qur'an al-Karim und seine ungefahre Bedeutung in deutscher Sparche, 4th ed: (Koln: 1991).
৬৪। Muhammad Asad, The Message of the Qur'an, 24:31, note 37.
৬৫। Ibid, 24:31. note 38.
৬৬। Anouar Hatem, L'Islam et les Droits de I'Homme (Association Suisse Arabe : 1974),15.
৬৭। Parvez Mansoor, "Human Rights: Secular Transcendence or Culture Imperialism," Muslim World Book Review 15, no.1 (Leicester:1994).
৬৮। Abul A'la Mawdudi, Human Rights in Islam, 2n ed. (Leicester:1980).17-34.
৬৯। See the "Human Rights Declaration" adopted by the OIC on 5 August 1990 in Cairo and the "Declaration of Human Rights" adopted on 19 September 1981 in London by the Islamic Council of Europe, a suborganization of the OIC.
৭০। M. Hamidullah, The First Written Constitution in the World, 3d ed (Lahore:1975).
৭১। No such difficulty for Muhammad Asad. See his very learned and wise input The Principles of State and Government in Islam. 2n ed. (Gibraltar: 1980).
৭২। M. Ghayasuddin, The Impact of Nationalism on the Islamic World (London; 1986).
৭৩। P.J. Vatikiotis, Islam and the State (London, New York, Sydney: 1987).
৭৪। Benjamin Barber, The Conquest of Politics (priceton: 1988).
৭৫। Abul A'la Mawdudi, Human Rights in Islam, 20.
৭৬। Parvez Monsoor, Muslim World Book Review 13, no.1 (Leicester: 1992).
৭৭। See the "Book of 'Aqdiyah" (16) in the Sahih of Muslim.
৭৮। In regards to this issue, the Arab-English "Review of Islamic Economics", Journal of the International Asociation for Islamic Economics, appearing in the Markfield Dawah Centre of the Islamic Foundation in Leicester, UK, should be sufficient proof in and by itself.

www.amarboi.org

৭৯। S.H.N. Naqvi, Ethics and Economics (Leiceter:1981), 19,
৮০। Ibid, 109
৮১। Ibid, 121, note 22, would allow interest in the amount of inflation.
৮২। Fritz Meier. "Zum vorrang des glaubens und des guten denkens vor dem wahrheitseifer bei den Muslimen," Oriens 32, 1990.
৮৩। The Islamic prohibition of tattoing (al Bukhari, 72, hadiths 827 and 830) ws entirely ineffective among the Berber tribes in Morocco and Algeria. This also creates feelings of contempt.
৮৪। For details, see Hussein Amin, Le livre du musulman desempare (Paris : 1992), 23-29.
৮৫। Virgil Gheroghiu, La vie de Mahomet (Paris: 1970): Karen Armstrong, Muhammad: A Western Attempt to understand Islam (London: 1991)
৮৬। 'Abd al Rahman al Kawakibi, Umm al Qura (The Mother of Cities). (1899)
৮৭। 'Ali' Abd al Raziq, al Islam wa Usul al Hukm (Cairo: 1925)
৮৮। I share this view with Azizah Y. al -Hibri, "Islamic constitution and the Concept of Democracy," Case western Reserve Journal of Islamic Law, no.24 (1992): 16, note 66.
৮৯। Muhammad Asad, This Law of Ours and Other Essays (Gibraltar; 1987). 1-71
৯০। Jamal al Banna, al Barnamaj al Islami (Cairo: 1991)
৯১। Its French version, Le Livre du musulman desempare, appeared in Paris in 1992
৯২। Aicha Daddi Abdoun, Sociologie et Historie des algeriens ibadities (Ghardaia: 1977).
৯৩। This Moroccan Author is not competent in Islamic history, philosophy, and theology. Yet she dabbles in all thesefields. See, as an example, Fatima Mernissi, Le harem politique, Le Prophet et les femmes 9Paris: 1987).
৯৪। Typical for this trend are Roger Garaudy's booklets For an Islam of the XXth Century (Paris: 1985) and L'Islam vivant (Alger: 1986).
৯৫। Muhammad Asad, State and Government in Islam (1st ed. 1961; 2n, Gibraltar: 1980), 11-17
৯৬। Seein great detail Si Boubakeur Hamza, Le Coran, Vol. 2 (Paris: 1985). Commentary to 24:2 and Hussein Amin, op. Cit.50.
৯৭। The relevant ahadith are to be found in Sahih al Bukhari, book 63 on Divorce, no. 31. and Book 82, on Punishment, nos. 807-10.
৯৮। M.M. Sharif, ed., A History of Muslim Philosophy, 2 vols. (Wiesbaden: 1966): Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy, 2n ed. (London and New York: 1983); Henry Corbin, History of Islamic Philosophy (London: 1993).

www.amarboi.org

লেখক পরিচিতি

Murad Wilfried Hofmann-এর জন্ম হয়েছিল ১৯৩১ সালের ৬ই জুলাই, জার্মানীর Aschaffenburg-এর এক ক্যাথলিক পরিবারে-যেখানে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বছরগুলো কাটিয়েছিলেন এবং "কৌশলগত বোমাবর্ষণ" তথা সামরিক দখলের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাজীবন শুরু হয় ১৯৫০ সালে, New York-এর Schenectady-তে Union College-এ। ১৯৫৭ সালে Munich University থেকে আইনের পারদর্শিতার উপর একটা ডক্টরেট ডিগ্রী এবং বার-এর পরীক্ষার মাধ্যমে, তিনি জার্মান আইনের উপর তার প্রতিষ্ঠানিক পড়াশোনার সমাপ্তি টানেন। এর পর পর আমেরিকার আইনের উপর পড়াশোনা করতে গিয়ে, ১৯৬০ সালে তিনি প্রখ্যাত Harvard Law School থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৬১-১৯৯৪ সময়কালে তিনি জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগে কর্মরত ছিলেন এবং পারমাণবিক প্রতিরক্ষার বিষয়াবলীর একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এছাড়াও তিনি Brussels-এ (১৯৮৩-৮৭) NATO-র তথ্য পরিচালক হিসেবে, আলজেরিয়ায় (১৯৮৭-৯০) এবং মরোক্কোয় (১৯৯০-৯৪) জার্মান রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮০ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, ১৯৮২-তে উমরাহ্ পালন করেন এবং ১৯৯২-তে তিনি হজ্ব করেন। ১৯৮৫-তে তিনি Diary of a German Muslim-এর জার্মান সংস্করণ প্রকাশ করেন, যা কিনা আরবী, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায়ও পাওয়া যায়।

১৯৯২ সালে তাঁর লেখা বই Islam the Alternative যখন জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়, তখন গণ-মানুষ পর্যায়ে একটা হৈচৈ পড়ে যায়। জার্মান গণ-মাধ্যম তথা সংসদে, বামপন্থী ও নারীবাদীরা তাকে "মৌলবাদী" বলে আখ্যায়িত করে তাঁর বিরুদ্ধে জঘন্য প্রচারণা ও আক্রমণ চালায়। এই বইখানাও আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পাওয়া যায়। এছাড়া Voyage to Makkah বইখানির প্রকাশনা ১৯৯৬ সালের গোড়ার দিকে নির্ধারিত।

তাঁর পরলোকগত প্রথম (আমেরিকান) স্ত্রীর পক্ষ থেকে, জনাব Hofmann-এর একজন পুত্র সন্তান রয়েছে। অবসর গ্রহণের পর, তিনি তাঁর তুর্কী স্ত্রীর সাথে Istanbul-এ বসবাস করছেন।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা